৭.০৪ নূপুরের ঝংকার – Bangla Library

৭.০৪ নূপুরের ঝংকার – Bangla Library

নূপুরের ঝংকার–১০৪

চমকে ফিরে তাকালো জাভেদ।

একটা মধুর নূপুরধ্বনি ভেসে আসছে তার কানে। জাভেদকে কোনোদিন এমন করে কোনো সুর আকৃষ্ট করতে পারেনি। বড় অপূর্ব লাগছে তার কাছে নূপুরের শব্দটা।

জাভেদ তাকালো তার অশ্বটার দিকে।

আপন মনে ঘাস খাচ্ছে সে।

জাভেদ এইমাত্র ফিরে এসেছে কান্দাই পর্বতের গোপন সূড়ঙ্গ অভিযান থেকে। কোনো এক চোরাকারবারী তার তিনটা গাড়ি ভর্তি করে কিছু মূল্যবান দ্রব্য অন্য দেশে পাচার করছিলো। গোপনসূত্রে তা জানতে পারে জাভেদ এবং সেই সূত্র ধরেই সে কয়েকজন অনুচর নিয়ে গিয়েছিলো গাড়ি তিনটাকে পাকড়াও করতে।

জয়ী সে হয়েছে।

গাড়ি তিনটাকে কৌশলে আটক করে গাড়ির মূল্যবান সামগ্রীগুলো জাভেদ নিজ দখলে এনে দিয়েছে, সে জিনিসগুলো একটা গোপন গুহায় বন্ধ করে রেখেছে।

ঐ মূল্যবান সামগ্রীগুলোর কি ব্যবস্থা করা যাবে যা করা উচিত তাই নিয়ে নির্জনে বসে গভীরভাবে ভাবছিলো জাভেদ, এমন সময় নূপুরের শব্দ ভেসে এলো তার কানে।

জাভেদের কঠিন মনটাও নাড়া দিয়ে উঠলো। সে উঠে দাঁড়ালো এবং মন্থর গতিতে এগিয়ে চললো যেদিক থেকে নূপুরের শব্দ আসছিলো সেইদিকে।

সুমধুর ঝংকার বলা যায়।

জাভেদ এগুচ্ছে কিন্তু সে ঠিক বুঝতে পারছে না এ শব্দটা কোথা থেকে আসছে।

যতই এগিয়ে চলছে ততই শব্দটা অস্পষ্ট হয়ে তার কানে বাজছে। এক সময় থেমে যায় শব্দটা।

জাভেদ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে।

গভীর জঙ্গল।

থমথম করছে চারদিক।

নির্জন নিস্তব্ধ।

নূপুরের সুর বা ঝংকার থেমে গেলেও জাভেদের মন থেকে সে আবেশ মুছে যায় না, সে তাকায় সম্মুখে, আশেপাশে কিন্তু কিছুই তার নজরে পড়ে না।

হঠাৎ সেখানে সর্বকনিষ্ঠ অনুচর সোহরাব এসে দাঁড়ায়, কুর্ণিশ জানিয়ে বলে– ছোট সর্দার, আপনি এখানে আর আমি আপনাকে খুঁজে ফিরছি। মাতাজি আপনাকে ডাকছেন।

জাভেদের মোহ কেটে যায় মুহূর্তে।

নূপুরের শব্দ মুছে যায় কান থেকে।

মায়ের মুখ ভেসে ওঠে চোখের সামনে, সে বলে চলল সোহরাব।

তার অশ্বপৃষ্ঠে চেপে বসলো জাভেদ।

সোহরাব তার অশ্ব নিয়েই এসেছিলো, সেও তার অশ্বপৃষ্ঠে চেপে বসলো।

দুজনে চললো আস্তানা অভিমুখে।

পথে কোনো কথা হলো না, কারণ বেগে অশ্বচালনা করেছিলো ওরা।

আস্তানায় পৌঁছেই মায়ের কক্ষে প্রবেশ করে মাকে অভিবাদন জানালো জাভেদ ও সোহরাব।

নূরী কক্ষে পায়চারী করছিলো, পুত্র এবং তাদের সর্বকনিষ্ঠ অনুচর সোহরাবকে কক্ষে প্রবেশ করতে দেখে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো।

জাভেদ বললো–আম্মি, তুমি আমাকে ডেকেছে?

হাঁ। গম্ভীর কণ্ঠে বললো–নূরী।

মায়ের গম্ভীর কণ্ঠ জাভেদকে বিব্রত করলো, কারণ মাকে সে বড় ভয় করতো। অপরাধীর মত চোখ তুলে তাকালো জাভেদ মায়ের মুখের দিকে।

বললো নূরী–জাভেদ, আমি মোটেই সন্তুষ্ট নই তোমার কাজে।

জাভেদ কোনো প্রশ্ন না করে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো প্রশ্নভরা দৃষ্টি নিয়ে।

নূরী পূর্বের চেয়ে বেশি গম্ভীর হয়ে বললো–তুমি ঠিক তোমার পিতার পথ অবলম্বন করছো। যদিও আমি জানতাম তোমাকে কিছুতেই সঠিক পথে পরিচালিত করা যাবে না, তবু তোমার এতখানি দুঃসাহস আমাকে বিশেষ চিন্তিত করেছে।

আম্মি, তুমি আমাকে যা বলতে চাইছো আমি বুঝতে পেরেছি কিন্তু তোমার চিন্তার কোনো কারণ নেই। বরং আমাকে সুপরামর্শ দিয়ে সঠিক পথের সন্ধান দাও।

কোনটা তোমার সুপরামর্শ আর সঠিক পথ বলো? বলল জাভেদ, আমি অভয় দিচ্ছি.... বললো নূরী।

জাভেদ বললো–আমি কান্দাই পর্বতে গোপন সুড়ঙ্গপথে যে তিনখানা গাড়ি আটক করেছি। তা কোনো এক অসৎ ব্যক্তি মানে চোরাকারবারীর গাড়ি। গাড়িতে রয়েছে দেশের মূল্যবান সামগ্রী যা বাইরে পাচার করে অসৎ ব্যবসায়ী কোটি কোটি টাকা মুনাফা করবে। আম্মি, আমি গাড়ি তিনখানা আটক করে কান্দাই পর্বতের এক গোপন স্থানে রেখে দিয়েছি। বলল আম্মি, আমি ঐ গাড়ির মূল্যবান মালামালগুলো এখন কি করবো।

এই বুঝি তোমার সৎ–মহৎ কাজ? বললো নূর।

হাঁ আম্মি।

তুমি দেখছি সম্পূর্ণ তোমার পিতাকে অনুসরণ করছে।

এটা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না বোন। জাভেদের দেহে যে বনহুরের রক্ত রয়েছে। ও কেননাদিন অন্যায় বরদাস্ত করতে পারবে না। কথাগুলো বলতে বলতে কক্ষে প্রবেশ করলো আশা।

সোহরাব তাকে হাত ধরে প্রবেশে সহায়তা করলো।

আশা বসলো একটা আসনে।

নূরী বললো–যদি তুমি আমার কথা না শোনো জাভেদ, তাহলে এ আস্তানা ছেড়ে চলে যাও। কারণ আমি চাই না এক বনে দুই সিংহ থাকবে, বুঝলে?

আশা কঠিন কণ্ঠে বলে উঠলো–নূরী!

হাঁ, আমি মোটেই পছন্দ করি না জাভেদ এই আস্তানায় থেকে তার পিতাকে অনুসরণ করে। একটু থেমে বললো নূরী–একদিন আমি নিজেও ভাবতাম বাপকা বেটা হবে এবং এ নিয়ে হুরের। সঙ্গে আমার অনেক কথা কাটাকাটিও হয়েছে।

জাভেদ বলে উঠলো–আম্মি, আমি জানি এক বনে দুই সিংহ বাস করতে পারে না, কিন্তু আমি তো সিংহ নই, সিংহশাবক মাত্র। তুমি যাই বলো আম্মি, আমার পথ তুমি রোধ করতে পারবে না। আজ আমি যে মালবাহী গাড়িগুলো আটক করেছি তা কি ভাবে কাজে লাগাতে পারবে সেই পথ বলে দাও। তারপর ফিরে তাকায় আশার দিকে–আশা আম্মু, তুমিও বলে দাও কি ভাবে ঐ আটক গাড়ির মূল্যবান বস্তুগুলো ব্যবহার করব?

হাঁ, ভাল কথা। নূরী, বোন তুমি ওকে সেই পরামর্শ দাও। বললো আশা।

কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থেকে বললো নুরী–যদি দেশ ও দশের মঙ্গল কামনাই উদ্দেশ্য হয় তাহলে যাও এই মুহূর্তে ঐ গাড়ির মালামালগুলো ঝাম দেশের অসহায় মানুষ যারা খেতে পায় না, পরতে পায় না, তাদের মধ্যে বিতরণ করে দিয়ে এসো। আজই তুমি চলে যাও, আমার কথামত কাজ করে ফিরে এসো। আমি জানতে পেরেছি দীর্ঘ কয়েক বছর ঝামদেশে ভাল ফসল ফলেনি। ওদেশের মানুষ বাইরের সাহায্যের আশায় হা করে আছে। প্রতিদিন অগণিত মানুষ না খেয়ে মারা পড়ছে

বললো জাভেদ–আমি জানি। ঝাম রাজ্যের দুর্ভিক্ষ শুধু কান্দাই নয়, গোটা পৃথিবীর বুকে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। অগণিত মানুষ না খেয়ে মরে যাচ্ছে, এসব আমি শুনেছি আম্মি।

তাহলে তুমি চলে যাও। রহমানকে সঙ্গে নিও, আরও কিছু অনুচর এবং অস্ত্র সঙ্গে নিও।

আচ্ছা আম্মি। জাভেদ আশা এবং নূরীর কদমবুসি করে বললো–দোয়া করো যেন ঠিকভাবে কাজ সমাধা করে ফিরে আসতে পারি।

আশার গন্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়লো দুফোঁটা পানি। ভাবের আবেগে ভাষা হারিয়ে ফেলেছিলো সে।

নূরী বললো–যাও, আল্লাহ তোমার সহায়ক।

বেরিয়ে গেলো জাভেদ।

সোহরাব বেরিয়ে গেলো তার সঙ্গে।

আশা বললো–উদ্দেশ্য যার মহৎ খোদা তার সহায়। তুমি কিছু ভেবে না বোন। জাভেদ বনহুরের সন্তান, আমি জানি সে কোনো কাজে বিমুখ হবে না। যাত্রা তার শুভ হোক।

*

কয়েকদিন অতিবাহিত হয়ে গেছে।

আজও জাভেদ ফিরে আসেনি।

আশা এবং নূরী উভয়েই চিন্তিত।

বললো আশা–নূরী, আজ কদিন হলো জাভেদ গেলো, আজও ফিরে আসছে না, বড় দুশ্চিন্তার কথা।

নূরী একটু হেসে বললো–চিন্তার কোনো কারণ নেই। সে ভাল কাজ করতে গেছে, আল্লাহ

হাঁ, এ কথা সত্য। উদ্দেশ্য মহৎ হলে জয় তার সুনিশ্চিত। তুমি তো জানোও তোমার বনহুর কতবার কত বিপদে পড়েছে তবু সে জয়ী হয়েছে, কারণ কোনদিন সে অন্যায় করেনি। হয়তো। লোকসমাজে তার কাজ অন্যায় বলে বিবেচিত হয়েছে কিন্তু সত্যি সে অন্যায় করেনি, অন্যায়কারীদের মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নিয়ে বিলিয়ে দিয়েছে অসহায় যারা তাদের মুখে।

তুমি যা বলছে সব সত্যি তবু তাকে বহুবার মৃত্যুর করাল গ্রাস আচ্ছাদন করতে চেয়েছি কিন্তু....আল্লাহ তাকে রক্ষা করেছেন.... কথাটা বলতে বলতে গলা ধরে আসে নূরীর, বলে সে–আমার জাভেদকেও আল্লাহ রক্ষা করবেন। কথায় কথায় বড় দেরি হয়ে গেলো, তোমার যে এখনও ওষুধ খাওয়া হয়নি।

আশা নূরীর হাত ধরে বললো–সত্যি, আমি তোমাদের বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছি। আমাকে নিয়ে তোমার কত ভাবনা।

ছিঃ ওকথা বলো না। তোমার সেবাযত্ন করতে পেরে আমি ধন্য। আশা বোন, তুমি যে আমাদের কতখানি তা তুমি বুঝবে না।

জানি তোমরা সবাই আমাকে ভালোবাসো আর ভালোবাসো বলেই তো আমার জন্য এতো করো বা করছে তোমরা।

তুমি একটু বসো আমি ফিরে আসছি এক্ষুণি। কথাটা বলে চলে যায় নূরী।

আশা হাতড়ে হাতড়ে উঠে দাঁড়ায় এবং ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসে আস্তানার বাইরে। নির্জন একটা জায়গায় এসে বসে সে। সামনে একটা ফাঁকা জায়গা, পাশে ঘন বন। একটা পাথরখন্ডে বসে ভাবতে থাকে কিছু।

এমন সময় কেউ এসে দাঁড়ায় তার পাশে।

আশা চমকে উঠলো।

এ পদশব্দ যেন তার পরিচিত মনে হলো।

বললো আশা—কে

আমি?

তুমি! তুমি বনহুর?

হাঁ কিন্তু তুমি আমাকে দেখতে পাচ্ছো না?

আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না বনহুর। উঠে দাঁড়ায় আশা।

আশা! বনহুর ওকে দুহাতে ধরে ফেলে।

আশার হৃদয় আনন্দে দুলে ওঠে, বলে আশা–তুমি ফিরে এসেছে বনহুরতুমি ভালো আছে?

হাঁ, আমি ভাল আছি কিন্তু তুমি এমন হলে কি করে? আর এখানেই বা কেন? অন্ধ হয়ে গেছে তুমি।....

সব জবাব তুমি পাবে বনহুর, সব জবাব তুমি পাবে। কিন্তু আমি আর তোমাকে কোনোদিন দেখতে পাবো না এই বড় দুঃখ আমার। বললো আশা।

বনহুর বললো–আশা, তুমি অন্ধ হয়েছে এ আমার কত ব্যথা তা তুমি বুঝতে পারবে না। নুরী–জাভেদ ওরা সব কোথায়? রহমান নাসরিন আর অন্যান্য সবাই...

আস্তানার ভিতরে। আমি হাতড়ে হাতড়ে আস্তানার বাইরে চলে এসেছি।

এসো আশা, আমার হাত ধরে আস্তানার ভিতরে চলো। বনহুর আশার দক্ষিণ হাতখানা মুঠায় চেপে ধরে আস্তানার ভিতরে পা বাড়ায়।

নূরী এগিয়ে আসছিলো, তার হাতে ওষুধের শিশি।

বনহুরকে দেখে আনন্দধ্বনি করে উঠলো নূরী–হুঁর, আমার হুর, তুমি এসেছো?

বনহুর আশার হাত মুক্ত করে দিয়ে নূরীর হাত দুখানা ধরে বলে–নূরী, অনেক বিপদ জয় করে তাবেই ফিরে আসতে সক্ষম হয়েছি। কিন্তু আশা অন্ধ হয়ে গেছে, এ কথা আমি ভাবতেও পারি না।

হাঁ হুর, বোন আশা দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছে। জাভেদ তাই তাকে দূরে রাখতে পারেনি, নিয়ে এসেছে আমার কাছে। আমি বোন আশাকে আর দূরে যেতে দেবো না।

নূরী!

হাঁ হুর।

আশা বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললো–আমার জন্য বোন নূরী কত কষ্ট করছে। নিজের সুখশান্তি বিসর্জন দিয়ে সে আমার সেবাযত্ন করে যাচ্ছে।

আশা আমি তোমার জন্য কতটুকুই বা করি। তুমি আমার হুরের জন্য যা করেছে কোনোদিন আমি তা ভুলবো না। আমি যতদিন বেঁচে থাকবো তোমার

সেবা করে যাবো। তা ছাড়া ফুল্লরা আছে সে তো সব সময় তোমাকে আগলে রাখতে চায়।

বনহুর বললো–ফুল্লরা কোথায় তাকে তো দেখছি না।

সবাই আছে, তোমার আগমন সংবাদ জানতে পারলে এক্ষুণি সকলেই এসে পড়বে হুর, এতদিন কোথায় ছিলো তুমি?

সে অনেক বড় কাহিনী, বলবো পরে।

বেশ, তাই বলল। এখন চলো, আস্তানার মধ্যে চলো।

নূরী আশার হাত ধরে নিয়ে এগোয়।

বনহুর চলে তাদের পিছু পিছু।

বনহুরের আগমনে আনন্দের বান বয়ে যায় কান্দাই আস্তানায়। বনহুরের অনুচরদের খুশি আর ধরে না। তারা উচ্ছল আনন্দে মেতে উঠে।

সবচেয়ে বেশি খুশি হয় তাজ।

অবলা জন্তু হলেও সে আসলে অবলা জন্তুর মত নয়। পশুপতি বলা যায়। পশু হলেও জ্ঞানবুদ্ধি তার আছে। সে মানুষের মতই বুঝে সবকিছু। অন্তর দিয়ে অনুভব করে।

বনহুর যখন তার পাশে এসে দাঁড়ালো তখন তার আনন্দ ধরে না। বারবার সে সামনের একটা পা দিয়ে মৃদু মৃদু আঘাত করে মনের আনন্দ প্রকাশ করছিলো।

পশু হৃদয়েও এত প্রভুভুবোধ থাকতে পারে তাজ তার জ্বলন্ত স্বাক্ষর।

*

অশ্বচালিত বাহন।

রথ বলা যায়।

ঝামের রাজকন্যা সন্ধ্যা ভ্রমণে বেরিয়েছে অশ্বচালিত রথে। হঠাৎ পথিমধ্যে অগণিত জনতার ভীড়ের চাপে বাহন তার থেমে যায়।

ক্রুদ্ধ রাজনন্দিনী ক্ষিপ্র কণ্ঠে বলে–এসব নেংটা মানুষগুলো আমার বাহনের পথে বাঁধা হানলো কেন?

সারথী জবাব দিলো অতি ভীতকণ্ঠে–রাজকুমারী, বিদেশী এক যুবক তার দলবল নিয়ে পথিমধ্যে দুঃস্থ জনগণের মধ্যে সাহায্য দান করছে।

ঝাম রাজ্যে বিদেশী যুবক।

হ্যাঁ!

এক্ষুণি তাকে বন্দী করে রাজদরবারে হাজির করে আনো। আমি পিতাকে যেয়ে সব সংবাদ জানাচ্ছি। চলো, বাহন চালাও…

কিন্তু

বলো সারথী কিন্তু কি?

বাহন যে অচল।

কেন?

পথে অগণিত জনতা–তারা ক্ষুধার্ত মানুষ। রথ চালাতে গেলে ওরা যে মারা পড়বে রাজকুমারী।

মরতে দাও। মরলে তাতে আমার বা রাজ্যের কোনো ক্ষতি সাধন হবে না, কারণ হাজারো মানুষের মধ্যে ওরা নগণ্য কজন মরবে।

তবুও তো এক একটা প্রাণ রাজকুমারী।

অমন শত শত প্রাণ ধুলোয় গড়াগড়ি খাচ্ছে। আমি ওদেরকে মানুষ বলে গ্রাহ্যই করি না।

সারথী, রথ চালাও। আমার ঘোড়ার খুরের নিচে ওরা পিষে মরুক।

সারথী রথ চালালো।

সঙ্গে সঙ্গে আর্তনাদে ভরে উঠলো চারদিক।

বাহন রাজনন্দিনীকে নিয়ে অগ্রসর হলো।

কিন্তু কিছুটা এগুতেই পথরোধ হলো পুনরায়।

রাজকুমারী রাগতভাবে তাকালো সামনে। সে দেখলো এক তরুণ তার রথের অশ্ব বলগা চেপে ধরেছে। একটুও অগ্রসর হতে পারছে না বাহনটা।

রাজকুমারী বললো–কি চাও তুমি?

তরুণ জবাব দেবার পূর্বেই বললো সারথী– রাজকুমারী, এই সেই তরুণ, যে বিদেশ থেকে প্রচুর সামগ্রী এনে বিলিয়ে দিচ্ছে আমাদের ক্ষুধার্ত জনতার মধ্যে।

এই সেই তরুণ যার কথা বললে? যে আমাদের দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। পথে চলাফেরা বন্ধ হবার যোগাড় হয়েছে– এই সেই তরুণ?

হাঁ, রাজকুমারী।

সারথী, তুমি রথ চালাও। ওকে পিষে ফেল।

সারথী রাজকুমারীর আদেশ পালন করতে গেলো কিন্তু। পূর্বেই তরুণ বলে উঠলো–সাধ্য থাকে রথ চালাও, আমি বাধা দেবো না।

সমস্ত জনতা ঘিরে ধরেছে ততক্ষণে তরুণকে।

বললো রাজকুমারী–সরে দাঁড়াও, নইলে সবাই মারা পড়বে।

বললো তরুণ–তোমার রথের চাকা গুঁড়ো হয়ে যাবে, একটুও এগুতে পারবে না।

তুমি কি চাও বলল? যা চাইবে দেবো তবু পথ মুক্ত করে দাও। রাজকুমারীর কণ্ঠ অনেকটা নরম হয়ে এসেছে।

তরুণ বললো–সারথী সরে বসো, আমি রাজকুমারীকে প্রাসাদে পৌঁছে দিতে চাই।

রাজকুমারী বললো–তোমাকে আমি বিশ্বাস করি না, কারণ তুমি আমার শত্রু।

রাজকুমারী, আমাকে তুমি শত্রুভাবে গ্রহণ না করে বন্ধুভাবে গ্রহণ করতে পারতে। অসহায় মানুষগুলোকে রথের চাকায় ওভাবে পিষে না মারলে এ ভয় তোমার বুকে দানা বাঁধতো না। তবে বিশ্বাস করতে পারো আমি একেবারে তোমার মত হৃদয়হীন নই।

এতবড় কথা তুমি আমার মুখের সামনে বলছো। জানো আমি কে?

তুমি কে নতুন করে আমাকে জানাতে হবে না। আমি তোমার বাহন দেখেই বুঝতে পেরেছি……।

তাহলে সম্মান দেখিয়ে কথা বলো।

সম্মান আদায় করে নেওয়া যায় না রাজকুমারী, সম্মান অতি পবিত্র জিনিস আর তা পাওয়া যায় চরিত্রগুণে। তরুণ কথা শেষ করেই সারথীর পাশে উঠে বসে এবং জনগণকে সরে দাঁড়াবার জন্য হাত দিয়ে ইংগিত করে।

সামনের পথ অল্পক্ষণে মুক্ত হয়ে যায়।

সারথী জড়োসড়ো হয়ে বসে থাকে।

রাজকুমারীর মুখে কোনো কথা নেই। রাগে–ক্ষোভে ভিতরটা তার জ্বলছিলো। কে এই তরুণ যার এত সাহস, এত স্পর্ধা। তার বাহনে উঠে বসে দিব্য সারথীর কাজ করছে।

রাজপ্রাসাদের নিকটে পৌঁছতেই রাজকুমারী বাহন থামাতে বলে এবং ক্ষিপ্রগতিতে নেমে যায়।

তরুণ নেমে দাঁড়ায় বাহন থেকে।

মাত্র কয়েক মিনিট, তরুণের দুপাশে দুজন প্রহরী এসে তাকে ধরে ফেলে।

তরুণ বলে–আমাকে আটক করতে হবে না। চলো পথ দেখিয়ে নিয়ে চলো।

প্রহরীদ্বয় অবাক হলো কিন্তু মুখে কিছু না বলে এগুতে লাগলো তারা।

তরুণ চললো।

রাজদরবার।

রাজা সিংহাসনে উপবিষ্ট।

রাজকুমারী দাঁড়িয়ে পিতার পাশে। চোখেমুখে তার আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে যেন।

তরুণসহ দুজন প্রহরী রাজদরবারে প্রবেশ করলো।

তরুণ অভিবাদন জানালো রাজাকে।

সৌম্য সুন্দর বয়স্ক মহারাজ হাত তুলে তরুণের অভিবাদন গ্রহণ করলেন।

তাকালেন মহারাজ কন্যার মুখের দিকে।

রাজকুমারী নাগিনীর মত ফোঁস করে উঠলো, ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললো– বাবা, এই সেই তরুণ যে তোমার বিনা অনুমতিতে রাজ্যে প্রবেশ করে প্রজাদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে।

মা, আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না তোমার কথা।

তরুণ বললো–রাজা, অনুমতি করুন আমি সব বলছি।

না, তা হবে না। তোমাকে কিছু বলতে হবে না, আমিই বলবো কি অন্যায় তুমি করেছে। রাজকুমারী কঠিন কণ্ঠে কথাগুলো উচ্চারণ করলো।

মহারাজ বললো–মা, তুমি ভুল করছে। আমি তোমার কথাও শুনবো, ওর কথাও শুনবো। আমি এখন পিতা নই–বিচারক।

বাবা!

হাঁ, আমি প্রথমে ওর কথাই শুনবো, তারপর তোমার কথা।

কিন্তু...

না, কোনো কিন্তু নয়, বলো তরুণ তোমার কথাই আগে শুনতে চাই? মহারাজ গম্ভীর অথচ শান্তকণ্ঠে কথাটা বললেন।

তরুণ বললো–আমি কে এ পরিচয় প্রথমে দেওয়া দরকার। আমি কান্দাই থেকে এসেছি–নাম জাভেদ। উদ্দেশ্য ঝাম দেশের জনগণের মধ্যে কিছু সাহায্য করা, কারণ আমরা জানি বেশ কয়েক বছর ঝামদেশে তেমন ফসল না ফলায় অত্যন্ত দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে।

হাঁ যুবক, তুমি ঠিক কথা বলছে। বলো তারপর?

আমরা কান্দাই বসে সব জানতে পেরেছি, বিশেষ করে মায়ের আদেশে এসেছি ঝামদেশে ক্ষুধার্ত জনতার মধ্যে কিছু খাদ্য এবং প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিলিয়ে দিতে। আপনার অনুমতিও গ্রহণ করেছি... আমরা যখন ক্ষুধার্ত জনতার মধ্যে এসব বস্তু বিলিয়ে দিচ্ছিলাম তখন আপনার কন্যা আমাকে আটক করার নির্দেশ দেন এবং

তুমি এর প্রতি অন্যায় করেছে মা। বললেন ঝামরাজ।

রাজকুমারী বললো–বাবা, ও আমার বাহনের পথ রোধ করে আমাকে অপমান করেছে।

মহারাজ, আমি যখন এসব দ্রব্য অসহায় ক্ষুধার্ত মানুষের মধ্যে বন্টন করে দিচ্ছিলাম তখন রাজকুমারীর বাহনের চাকায় পিষ্ট হয়ে প্রাণত্যাগ করে বেশ কয়েকজন ক্ষুধার্ত মানুষ, তাই আমি বাহনের অশ্বের লাগাম চেপে ধরে বাহন থামিয়ে দিয়েছিলাম।

ও এই কথা! তুমি ঠিকই করেছে যুবক। আমার বিচারে তুমিই জয়ী হলে আর দোষী আমার কন্যা রাজকুমারী জেবা। মহারাজ কথাটা বলে দরবার ত্যাগ করে রাজপুরীর দিকে চলে গেলেন।

জেবা ক্রুদ্ধ নাগিনীর মত বলে উঠলো–তুমি পিতার কাছে অপরাধী না হলেও আমার কাছে অপরাধী। তোমাকে ঝামদেশ ত্যাগ করার জন্য নির্দেশ দিলাম। যাও, চলে যাও তুমি।

জাভেদ জেবাকে কুর্ণিশ জানিয়ে প্রস্থান করলো।

*

মিঃ হারুন, মিঃ শংকর রাও এবং নূর সেদিন সিন্ধি পর্বত হতে ফিরে এসেছেন তবে তারা বিফল হননি। সিন্ধি পর্বতের অভ্যন্তরেই যে মিস মতিবাঈকে আটক করে রাখা হয়েছে এটা তাঁরা বুঝতে পেরেছেন।

এখানে যে একটা দল আত্মগোপন করে কাজ করে যাচ্ছে এটা পুলিশমহল যেন উপলব্ধি করে নিলো।

পুলিশমহলের ধারণা দস্যু বনহুর ছাড়া এ কাজ আর কেউ করছে না। শুধু দুজন পুরানো ব্যক্তির মনে সন্দেহ আছে এ কাজ দস্যু বনহুরের নাও হতে পারে। কারণ দস্যু বনহুর বা তার দল কোনোদিন নারীহরণ করেনি বা করে না।

এই পুরানো ব্যক্তি দুজন অন্য কেউ নয়, পুলিশ প্রধান মিঃ হারুন এবং শংকর রাও। এরা। অতি সাবধানে নূরের কাছে সব গোপন রেখে কাজ করে যাচ্ছেন। তাদের মূল উদ্দেশ্য নূর যদি পারে তার পিতাকে গ্রেপ্তার করতে যা তাদের দ্বারা সম্ভব হয়নি।

এত বুদ্ধিমান হয়েও নূর এ প্রবীণ ব্যক্তিদ্বয়ের কারসাজি ধরতে পারে না। দস্যু বনহুরকে পাকড়াও করাই যেন তার জীবনের চরম ব্রত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নূর সব সময় অস্থিরচিত্ত নিয়ে বনহুরের সন্ধান করে ফিরছে। তার যেন সাধনা বনহুরকে গ্রেফতার করা।

মনিরা এ নিয়ে নূরকে বহুবার সাবধান করে দিয়েছে। এই ভয়ংকর কাজ থেকে তাকে বিরত থাকতে বলেছে।

কিন্তু নূর মায়ের কথায় হেসে বলেছে–তোমার ছেলে কচি খোকা বা দুর্বল মানুষ নয় যে, একটা দস্যুকে ভয় করে চলবে। দেখো আম্মু, আমি বনহুরকে গ্রেপ্তার

করবোই।

মনিরা সেদিন কোনো কথা বলতে পারেনি, শুধু নির্বাক স্থবিরের মত চেয়ে রয়েছে।

নুর মায়ের হাত ধরে বলেছিলো–তুমি শুধু দোয়া কর আম্মু যেন সফলকাম হই।

সেদিনের কথাগুলো আজও মনিরার মনে পড়ে। নূরকে কিছুতেই যেন বোঝাতে পারছে না। যে দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার থেকে ক্ষান্ত হও।

মনিরার আরও একটা ভয় বনহুর একদিন বলেছিলো একটা সুড়ঙ্গ পথ কান্দাই আস্তানা থেকে সোজা চলে আসছে চৌধুরীবাড়িতে। দীর্ঘ সুড়ঙ্গ পথের খনন কাজ চলেছে, হয়তো বা এতদিনে অনেক এগিয়ে এসেছে। বলেছিলো সে, একদিন দেখবে আচমকা এসে হাজির হবো বাইরের জগৎ দিয়ে নয়, ভূগর্ভ সুড়ঙ্গপথ দিয়ে। কেউ দেখবে না জানবে না, সেদিন তুমি আর আমি কত না আনন্দ উপভোগ করবো।

ভাবে মনিরা, তবে কি আজও সেই সুড়ঙ্গপথ তৈরি শেষ হয়নি? হয়তো বা হয়নি, হলে তো সে জানতেই পারতো। চৌধুরীবাড়ির কোনো এক গোপন স্থানে সুড়ঙ্গমুখ থাকবে। কেউ টের পাবে না হয়তো বা ম্যানহোল ধরনের কোনো আবরণ দিয়ে ঢাকা থাকবে, হয়তো বা কোনো গাছের গুঁড়ির তলদেশে থাকবে সুড়ঙ্গের মুখ।

কত কথা ভাবে মনিরা শুয়ে শুয়ে।

নূর মাঝে মাঝেই আসে খোঁজ নিতে কেমন আছে তার মা আর দাদীমা, কেমন আছেন সরকার সাহেব, কেমন আছে বা থাকে বাড়ির সবাই।

সব সময় নময় অঙ্ক দেয় দল নিয়েই কাল তিলির বয়সও কম হয়নি আলিপের

মনিরা বেগম অনেক বুড়ো হয়ে গেছেন।

সব সময় নামায আর দোয়া দরুদ নিয়েই কাটান তিনি।

সরকার সাহেবের অবস্থাও শোচনীয় বলা যায়, কারণ তাঁর বয়সও কম হয়নি, আশি পেরিয়ে গেছে।

একটা ছড়ি হাতে ধীরে ধীরে চলেন তিনি। আগের মত আর শক্তিও পান না। চোখেও দেখেন না। তবুও কর্তব্য পালনে তিনি বদ্ধপরিকর। এ বাড়ির সঙ্গে তাঁর জীবনের নাড়ীনক্ষত্র যেন গাঁথা হয়ে আছে।

হঠাৎ করে ডাক আসবে পরপারের কে জানে।

মনিরার বেশি ভাবনা সরকার সাহেব আর শাশুড়ীকে নিয়ে ওরা যেন এ বাড়ির সজাগ প্রহরী। ওদের মুখের দিকে তাকালে মনিরা পরম শান্তি লাভ করে। মনিরা তাই সব সময় পিতৃস্থানীয় সরকার সাহেব আর শাশুড়ীর সেবাযত্ন নিজ হাতে করে। চাকরবাকর দাসদাসীর উপর এদের সেবাযত্নের দায়িত্ব দিয়ে যেন সে স্বস্তি পায় না।

নানা চিন্তার মাঝেও মনিরা আনন্দ পায়, তৃপ্তি পায় তাই সে এ বাড়ি ছেড়ে মুহূর্তের জন্য কোথাও বেড়াতে যান না। একটু দূরে গেলে মনটা তার অস্থির হয়ে উঠে না জানি বৃদ্ধা মামীমা, বৃদ্ধ সরকার সাহেবের কোনো অযত্ন হলো কিনা।

মনিরার আদরযত্নে পরম আহলাদিত, তৃপ্ত সরকার সাহেব। কোনো কোনো দিন তিনি বলেই বসেন–মা মনি, আমি কি তোমার কচি খোকা, তাই এত আদরযত্ন করছ?

মনিরা হেসে বলেছিলো–আমার সন্তান আপনি আর মামীমা…

আর নূর সে তোমার কেউ নয়।

না, ও আমার দুঃখ বোঝে না, ওকে আমি সন্তান বলবো না।

ছিঃ নূর শুনলে খুব রেগে যাবে কিন্তু…

তাতে আমার বয়েই যাবে।

ঠিক ঐ সময় নূর পেছন থেকে পা টিপে টিপে মাকে জাপটে ধরে বলে–আম্মি, আমি তোমাকে শাস্তি দেবো। সরকার দাদু আর দাদীমাই যদি তোমার সন্তান হবে

তাহলে আমি আর এ বাড়িতে আসবো না।

তাতে আমার বয়েই যাবে? বললো মনিরা।

নূর হেসে বললো–আম্মি তুমি আমাকে মোটেই ভালোবাসো না। ভালোবাসো ঐ দাদুকে ...

সরকার সাহেব বলে উঠলেন–আর আমি ভালোবাসি নূর দাদুকে, এবার হলো তো?

এমন কত কথা আজ শুয়ে শুয়ে ভাবছিলো মনিরা।

এমন সময় দরজায় মৃদু আঘাত হলো।

বহুদিন পর পরিচিত সেই শব্দ।

মনিরার বুক দুলে উঠলো আনন্দে।

দেয়ালঘড়িটার দিকে তাকালো সে।

রাত দুটো বেজে ত্রিশ মিনিট।

মনিরা দরজা খুলে দিলো।

জমকালো পোশাকপরা অবস্থায় স্বামীকে দেখে মনিরার বুকটা আনন্দে দুলে উঠলো। অস্ফুট কণ্ঠে বললো–তুমি।

হাঁ মনিরা।

এতদিন কোথায় ডুব মেরেছিলে?

সে অনেক কথা–বলবো, সব বলবো–চলো ঘরের ভিতর চলো।

মনিরার পাশ কেটে ভিতরে প্রবেশ করলো বনহুর।

কতদিন পর তার স্বামী এসেছে, মনিরা মুখে যত রাগ–অভিমানই করুক না কেন, অন্তর তার আসলে ভরে উঠেছে।

কক্ষে প্রবেশ করে মনিরা স্বামীর দিকে অপলক চোখে তাকালো।

কতদিন সে এ ড্রেসে স্বামীকে দেখেনি।

মনিরার চোখে স্বামীর এ ড্রেস অপূর্ব লাগে।

মনিরা মনিরকে প্রথম দেখেছিলো এই পোশাকে, ভালোবেসেছিলো তাকে সেদিন এই পোশাকেই আজও মনিরা কেন যেন নির্ণিমেষ নয়নে বনহুরের পা থেকে মাথা পর্যন্ত লক্ষ্য করছিলো।

হেসে বললো বনহুর–অমন করে কি দেখছো মনিরা?

মনিরা বললো– কিছু না।

সত্যিই বলছো কিছু না? তুমি আজ যেমন করে আমার দিকে তাকিয়ে দেখছিলে তাতে মনে হচ্ছিলো আমাকে তুমি প্রাণভরে দেখে নিচ্ছো, হয়তো আর দেখবে না…

ছিঃ! অমন কথা বলো না। আমি তোমার এই পোশাক দেখছিলাম, তোমাকে যা সুন্দর লাগছে।

আজ কি নতুন দেখছে আমাকে?

কতকটা তাই।

মনিরা।

বলো?

সত্যি জীবনে যে বেঁচে আছি এটা বড় আশ্চর্য। একটু থেমে একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললো বনহুর–যমদূত আর আমার লড়াই চলেছিল। শেষ পর্যন্ত আমিই জয়ী হলাম হাসলো বনহুর।

মনিরা বললো–কবে তুমি ভাল মানুষটির মত থাকো বলো তো। যমদূত আর তোমার লড়াই তো চিরাচরিত ব্যাপার। এতে আশ্চর্য হবার কি আছে। তা হঠাৎ কোথা থেকে আবির্ভাব শুনি।

আস্তানা থেকে।

ও বুঝেছি…একটু গম্ভীর হয়ে বললো মনিরা।

বনহুর মনিরার চিবুকটা তুলে ধরে বললো–কি বুঝলে মনিরা

যা বুঝবার বুঝেছি। সবই আমার অদৃষ্ট। এখন এলে কোন পথে?

নতুন পথ দিয়ে আজ এসেছি মনিরা। কান্দাই আস্তানা থেকে চৌধুরীবাড়ি যে সুড়ঙ্গপথ তৈরি হচ্ছিলো তা সমাধা হয়েছে। আমি সেই পথে এসেছি মনিরা।

সত্যি বলছো?

হ্যাঁ, সত্যি বলছি। যখন খুশি এসে পড়বো, আর তোমার অভিমানভরা মুখ আমার দেখতে হবে না।

কথাটা বলে বনহুর মনিরাকে টেনে নেয় কাছে।

মনিরা গভীর আবেগে স্বামীর বুকে মাথা রাখে। কতদিন সে স্বামীকে নিবিড় করে কাছে পায়নি। স্বামীর বুকে মেয়েদের পরম তৃপ্তি অনাবিল শান্তি মনিরার হৃদয় উপলব্ধি করে।

*

সর্দার, সিন্ধি পর্বতের অভ্যন্তরে মিস মতিবাঈকে আটকে রাখা হয়েছে একথা সত্যি। তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি। বনহুরকে কুর্ণিশ জানিয়ে কথাগুলো বললো কায়েস।

বনহুর আপন মনে সিগারেট পান করছিলো। সে কায়েসের কথায় মুখ তুলে বললো–আমি জানতাম আর জানতাম বলেই তোমাদেরকে সঠিক সন্ধান নিতে বলছিলাম।

সর্দার?

বলো?

কান্দাই পুলিশমহল জানে এ কাজ আপনি করেছেন এবং আপনাকে সন্দেহ করে নানাভাবে তারা আপনাকে গ্রেপ্তারের জন্য উঠেপড়ে লেগেছে।

সিগারেটের শেষ অংশটা এ্যাসট্রের মধ্যে গুঁজে রেখে বললো বনহুর– আমি সে খবরও জানি কায়েস, চিন্তার কোনো কারণ নেই; আমি বহু দূরদেশে কোনো এক অজানা অচেনা সমুদ্রবুকে জাহাজে বসে বিস্ময়করভাবে জানতে পেরেছি মিঃ ভৌমের কন্যা মিস মতিবাঈ সম্বন্ধে। সব আমি অবগত হয়েছি। একটু থেমে পুনরায় বললো বনহুর–মতিবাঈকে উদ্ধার করে আমি নিজে গিয়ে পৌঁছে দেবো তার বৃদ্ধা মায়ের কাছে। শুধু মিস মতিবাঈকেই আমি উদ্ধার করবো না বা উদ্ধার করে ক্ষান্ত হবো না, আমি সমূলে ধ্বংস করবো সিন্ধি পর্বতের অভ্যন্তরে নরপশুদের গোপন আড্ডাখানা। এরা দীর্ঘদিন ধরে এ পর্বতের অভ্যন্তরে আস্তানা গেড়ে কুকর্ম চালিয়ে চলেছে।

সর্দার।

বলো?

বড় কঠিন কাজ সিন্ধি পর্বতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা।

ইনশাআল্লাহ আমার অসাধ্য কিছুই নেই। জয়ী আমি হবোই…

কিন্তু সিন্ধি পর্বত…

বল, থামলে কেন?

এই পর্বতের চারপাশে পুলিশ কড়া দৃষ্টি রেখেছে।

তাই ভয় হচ্ছে তোমার?

ঠিক ভয় পাচ্ছি না সর্দার, তবে সাবধানে এগুতে হবে। ঐ নরপশুর দল অতি ভয়ংকর, কারণ ওদের নিকটে এক ধরনের অস্ত্র আছে যেটা দেহে স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু ঘটে।

একটু হেসে বললো বনহুর–সে অস্ত্র আমার হাতেও এসেছে কায়েস, কারণ আমি নিজেও সে অস্ত্র ব্যবহার করেছি তবে, মানুষের দেহে নয়, এক ভয়ংকর তলায় যমদূতের দেহে…

সর্দার

হাঁ, সে এক ভীষণ ভয়ংকর অক্টোপাশ।

সর্দার, বড় জানতে ইচ্ছে হচ্ছে সেই ঘটনাটা।

বনহুর সংক্ষেপে সমস্ত কাহিনী কায়েসের কাছে বলে যায় এবং তার জাহাজখানার কথাও বলে। কান্দাই সমুদ্রে কোনো এক গোপন স্থানে জাহাজখানা নোঙ্গর করে রাখা হয়েছে। জাহাজখানা যে সারেংগণ এবং ক্যাপ্টেন নিয়ে কান্দাই সমুদ্রে পৌঁছে দিয়েছে তারা বিদায় নিয়ে ফিরে গেছে নিজের দেশে।

কায়েস সব শুনলো, তার দুচোখে বিস্ময় ফুটে উঠলো। সর্দার কত বড় অসাধ্য সাধন করে ফিরে এসেছে তা হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করলো সে। জাহাজখানা দেখার জন্য উদগ্রীব হলো কায়েস।

বনহুর বললো–সময় এলে এ জাহাজ নিয়ে তোমাকেও কাজ করতে হবে। এ জাহাজখানা নাসফা সরকার আমাকে উপহার স্বরূপ দিয়েছেন।

কায়েস বললো–সর্দার, আপনি তাদেরকে যে মহামূল্য মুক্তা দিয়েছেন তাতে এ জাহাজ আপনাকে দেবে তা তেমন আশ্চর্য কিছু নয়।

হাঁ, তুমি ঠিক বলেছো কায়েস। আমি যে মুক্তাগুলো উদ্ধার করে নাসফা সরকারকে দিয়েছি। তা সত্যি বহু মূল্যবান। যাক সে কথা, এবার শোনো কায়েস, যে দলটি সিন্ধি পর্বতে আত্মগোপন করে কান্দাইয়ে কুকর্ম চালিয়ে চলেছে তারা দীর্ঘ সময় ধরে ঐ জায়গায় আস্তানা গেড়ে আছে যা তুমি নিজেও জানো।

হাঁ, সর্দার জানি এবং আপনাকে বলেছি।

পুলিশবাহিনী জানে এ কাজ আমিই করেছি।

হাঁ, পুলিশবাহিনীর সেই ধারণা।

ধারণা হওয়াটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। তবে জেনে রাখো কায়েস, পুলিশবাহিনী ওদের কিছু করতে পারবে না, কারণ ভূগর্ভ দিয়ে একটা সুড়ঙ্গপথ চলে গেছে অনেক দূরে। যে পথে তারা লোকচক্ষু এড়িয়ে সিন্ধি পর্বতের অভ্যন্তরে যাওয়া–আসা করে এবং এ কারণেই পুলিশমহল অথবা অন্য কেউ তাদের সন্ধান জানতে পারেনি। ওরা নির্বিঘ্নে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে।

সর্দার, আপনি প্রকাশ্যপথে ঐ পর্বতের নিকটে পৌঁছলেই আপনাকে পুলিশমহল

গ্রেপ্তার করবে, এই তো?

হা সর্দার।

বলেছি তো সেজন্য তোমরা কিছু ভেবো না।

কায়েস আরও কিছু বলতে চায়।

মাথা চুলকাচ্ছিলো সে।

বললো বনহুর–কিছু বলবে?

সর্দার, পুলিশমহলের সঙ্গে রয়েছে নূর।

হেসে বললো বনহুর– আমি জানি।

কায়েস একনজর বনহুরের দিকে তাকিয়ে চলে গেলো।

বনহুর শয্যায় ভালভাবে ঠেশ দিয়ে বসলো। গত দিনগুলোর কথা স্মরণ হলো তার, মনে পড়লো নিশোর কথা। নিশোর কথা মনে পড়তেই চোখ দুটো তার সিক্ত হয়ে উঠলো। একটা সরল সুন্দর পবিত্র মুখ। ওর উচ্ছল হাসির শব্দ এখনও যেন তার কানে ঝংকার তোলে। মাত্র কয়েকটা কথা সে বলতে শিখেছিলো তার কাছে নিশো নামটা তার হৃদয়ে গাঁথা হয়ে থাকবে যতদিন সে…

কি ভাবছো হুর?

ওঃ নূরী।

অমন করে চমকে উঠলে কেন?

ভাবছিলাম এক বিস্ময়কর ঘটনার কথা।

তোমার জীবনে বিস্ময়কর বলে কিছু আছে নাকি? সবই তো তোমার জীবনে সহজ ঘটনা।

সে কথা অবশ্য মিথ্যা নয় নূরী।

আচ্ছা বলো তো, সত্যি করে বলবে তুমি কার কথা ভাবছিলে?

অনেক কথাই ভাবছিলাম, তার মধ্যে একটা মেয়ে সবচেয়ে বেশি আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে নূরী, সে মেয়েটার নাম নিশো।

আমি সব শুনেছি, যখন তুমি কায়েসের কাছে বলছিলে তখন আমি আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনলাম। হুটা, তুমি কি মেয়েটাকে ভালবেসেছিলে?

ভাল লেগেছিলো।

তবে সঙ্গে নিয়ে এলেই পারতে।

তোমার কথা ঠিক অনুধাবন করতে পারলাম না নূরী।

তা পারবে কেন? মেয়েটাকে ভালোবাসলে অথচ তাকে নিয়ে এলে না–বড় আফসোস। আর তাই নিয়ে খুব ভাবছো এখন।

নূরী, তোমার মুখে এমন কথা শুনবো ভাবতে পারিনি। তুমি তো আমার সব জানো। ভাল লাগা আর ভালোবাসা এক জিনিস নয়। নিশোকে আমার ভাল লেগেছিলো, বড় সুন্দর ছিলো সে। নূরী, মেয়েটা আমাদের ভাষায় কথা বলতে পারতো না কিন্তু তার চোখেমুখে ফুটে উঠেছে অন্তরের কথা। যাক ওসব, এখন শোনো নুরী, এসে অবাধ আমি জাভেদকে দেখলাম না, সে কি তবে ঝাম থেকে এখনও ফেরেনি?

না হুর, জাভেদের জন্য বড় চিন্তা হচ্ছে। রহমান ভাই এবং আরো কয়েকজন অনুচর গেছে জাভেদের সঙ্গে। জানি না আজও সে কেন ফিরে আসছে না। কথাগুলো বলে নূরী বসলো বনহুরের পাশে।

বনহুর বললো–কিছু ভেবো না নূরী, ও সুস্থ দেহে ফিরে আসবে।

জানি বাপকা বেটা…

পারলে না তো ওকে ঠিকপথে চালনা করতে।

পারবো কেমন করে, শরীরে যে তোমার রক্ত। তোমার স্বভাব ও গোটাই পেয়েছে। হুর, একটা কথা তোমাকে বলবো।

বলো।

আমি ভেবেছিলাম জাভেদ বড় হলে ফুল্লরার সঙ্গে ওর বিয়ে দেব। আমিই শুধু নয়, তার মায়েরও তাই ইচ্ছা। তাছাড়া ফুল্লরা জাভেদকে ভালবাসে।

বলো থামলে কেন, আর কি বলতে চাও?

ফুল্লরা যতই ওর দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে ততই জাভেদের ওর প্রতি অবহেলা বাড়ছে। সত্যি তুমি জানো না ফুল্লরা ওকে কত ভালবাসে।

বনহুর হঠাৎ হেসে উঠলো– হাঃ হাঃ হাঃ, এই কথা। এটা তো তোমার বোধগম্য হওয়া উচিত জাভেদ যা করবে তা সে করবেই–তুমি, আমি বা ফুল্লরা নিজেও এ ব্যাপারে কিছু করতে পারবো না। ফুল্লরা মেয়েটা সত্যি ভাল, আমি ওকে পছন্দ করি। ঠিক তোমার মত উচ্ছলচাঁদের আলোর মত স্নিগ্ধ.. অপূর্ব বলা যায়। আচ্ছা ওর নীলমনি হারটা কি আছে?

হাঁ, ওটা ও সব সময় গলায় পরে থাকে। তোমার দেওয়া উপহার ঐ তো ফুল্লরা এসে গেছে।

ফুল্লরা এসে দাঁড়ালো, বনহুরকে কুর্ণিশ জানালো সে সুন্দরভাবে।

বনহুর বললো–ফুল্লরা, তুমি কোথায় ছিলে?

ফুল্লরা কোনো জবাব দিলো না।

নূরী বললো–ফুল্লুরা বনফুলের সঙ্গে খেলা করতে যায়।

বনফুল। কে বনফুল?

তুমি চিনবে না, সে এক জংলী মেয়ে। মেয়েটি ওকে খুব ভালবাসে। ওর সঙ্গে ফুল্লরা সারাদিন বনে বনে খেলা করে বেড়ায়। যাও ফুল্লরা, ও বুঝি তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।

ফুল্লরা পুনরায় সর্দারকে কুর্ণিশ জানিয়ে বেরিয়ে যায়।

বনহুর তাকিয়ে থাকে ওর চলে যাওয়া পথের দিকে।

নূরী হেসে বলে–ভারী মিষ্টি মেয়ে।

হাঁ, নূরী ঠিক বলেছো। কথাটা বলে হাসে বনহুর।

এখানে যখন ফুল্লরা আর জাভেদকে নিয়ে বনহুর আর নূরী কথা বলছিলো তখন ঝাম দেশে জনসাধারণের মধ্যে খাদ্য বিতরণ করছিলো জাভেদ আর রহমান।

তাদের সহযোগিতা করে চলেছে তাদের অনুচরগণ।

তিনদিন বিতরণের পর কাজ শেষ হয় জাভেদের।

আজ জাভেদ আর তার দলবল বিশ্রাম নিচ্ছিলো। আগামীকাল তারা রওয়ানা দেবে কান্দাই অভিমুখে।

জাভেদ আজ অত্যন্ত খুশি, নিজের হাতে এতগুলো মূল্যবান সামগ্রী গরিব অসহায় লোকদের মধ্যে বিতরণ করতে পেরেছে বলে।

এ পৃথিবীতে কেউ চায় বিলিয়ে দিতে, তার মধ্যেই সে পরিতৃপ্ত, আর কেউ আছে অপরের সম্পদ আত্মসাৎ করতে, যত পায় ততই লালসা বাড়ে। কারণ সম্পদের মোহ তাদের হৃদয়কে সদা সর্বদা আচ্ছাদন করে রেখেছে। লোভ–লালসার বেড়াজালে জড়িয়ে আছে তারা সর্বক্ষণ। তারা অমানুষ।

যাদের লোভ-লালসা-মোহ নেই কোনো বস্তুর প্রতি তারা সত্যিকারের মানুষ। হৃদয় তাদের অনেক বড়। প্রয়োজনবোধে যা দরকার তা সবারই কাম্য। তবে

অসৎ উপায়ে নয়, সতোর সঙ্গে উপার্জন করা অর্থ বা সম্পদ মানুষের জীবনে চিরস্থায়ী হয়।

জাভেদ আজ পরিতৃপ্তই শুধু নয়, অনাবিল আনন্দে উচ্ছল তার হৃদয়।

জাভেদ যখন নিজের হাতে সামগ্রীগুলো দুস্থ জনগণের মধ্যে বিলিয়ে দিচ্ছিলো তখন রহমান হট চিত্তে সে দৃশ্য উপভোগ করছিলো, যেন তার সর্দার বনহুর ফিরে গেছে তার বিগত জীবনে সেই বিশ বছর আগে। সেই হাস্যোজ্জ্বল দীপ্ত মুখ, আনন্দে উচ্ছল চোখ দুটো। সেই মুখ, সেই চোখ, সেই বলিষ্ঠ চেহারা।

রহমান হারিয়ে গিয়েছিলো জাভেদের মধ্যে তার সর্দারকে দেখতে পেয়ে।

রহমান শুধু দেখছিলো আর অনুচরদের সহযোগিতা করতে নির্দেশ দিচ্ছিলো। তার দৃষ্টি ছিলো সবদিকে।

জাভেদ যখন সামগ্রীগুলো বিতরণ শেষ করে ভীড়ের মধ্য হতে বেরিয়ে আসে তখন রহমান তাকে অনুসরণ করে।

এখানে জাভেদের অনেক শত্রু সৃষ্টি হয়েছে জানে রহমান নূরী বারবার রহমানকে বলেছে জাভেদ ছেলেমানুষ, ওর প্রতি তুমি খেয়াল রেখো রহমান ভাই।

নূরীর কথাগুলো সব সময় খেয়াল আছে রহমানের। তাই সে এক মুহূর্ত জাভেদকে দৃষ্টির আড়াল হতে দেয় না।

জাভেদ যখন ভীড় ঠেলে বেরিয়ে এলো তখন রহমান তাকে অনুসরণ করলো কিন্তু বেশিক্ষণ তাকে দৃষ্টিতে ধরে রাখতে পারলো না।

রহমানের দৃষ্টি এড়িয়ে সে চলে গেলো নির্জনে ঝাম নদীতীরে।

নির্জন নদীতীরে বেশ লাগছে জাভেদের।

অনেক লোকের ভীড়ে হাঁপিয়ে উঠেছিলো সে এতক্ষণ, যদিও পরম আনন্দ উপভোগ করছিলো।

দৃষ্টি তার সীমাহীন আকাশে ছড়িয়ে পড়ে।

অনেক রং যেন খেলা করছে নীল আকাশের গায়ে।

সাদা, হলুদ, নীল পালতোলা নৌকাগুলো ভেসে যাচ্ছিলো নদীর বুক বেয়ে কতকটা রাজহংসীর মত সারিবদ্ধভাবে।

জাভেদ নদীতীরে সবুজ ঘাসে বসে বসে দেখছিলো। এক সময় সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে।

সোনালী সূর্যের আলো কেমন যেন নিষ্প্রভ হয়ে আসে।

তবু জাভেদ উঠি উঠি করেও উঠতে পারে না। নদীতীরের নির্মল বাতাস তার বড় ভাল লাগছিলো। একটু পূর্বে একখানা সৌখিন বজরা ভেসে গেলো তার সামনে দিয়ে। বজরার জানালায় হাল্কা নীল রঙের পর্দা ছিলো তাই, বজরার ভিতরে নজর যায়নি। ভিতরে নারী অথবা পুরুষ আছে তাও বোঝা যায়নি।

তবে বজরার সাজসজ্জা চোখ ঝলসানো ছিলো।

দৃষ্টির আড়ালে বজরা চলে গেলো।

জাভেদ উঠে পড়লো অনিচ্ছা সত্ত্বেও। সন্ধ্যার অন্ধকার তখন বেশ গাঢ় হয়ে গেছে।

জাভেদ উঠে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই একটা আর্তচিৎকার ভেসে আসে তার কানে।

একটা নারীকন্ঠের চিৎকার।

কিছুক্ষণ পূর্বে যে বজরাখানা উত্তর দিকে চলে গিয়েছিলো এ আর্তচিৎকার সেই বজরা থেকেই ভেসে আসছে তাতে কোনো ভুল নেই।

মুহূর্তে জাভেদের শরীরের রক্ত গরম হয়ে উঠলো। সে কিছুদূর অগ্রসর হলো, শব্দটা ঠিক ঐ বজরা থেকেই আসছে! জাভেদ মোটেই বিলম্ব না করে ছুটে এসে নদীতীরে থেমে থাকা একটা মোটরবোটে চেপে বসে ষ্টার্ট দিলো।

মোটরবোট নিয়ে কোনো বিলাসী ধনী ব্যক্তি নদীতীরে হাওয়া সেবন করতে এসেছিলো, তারা তাদের মোটরবোট হারানোর ভয়ে চিৎকার করে উঠলো।

অবশ্য তারা বেশ দূরে ছিলো তাই এসে বাধা দিতে পারলো না। তার পূর্বেই নদীবক্ষে স্পীডে মোটরবোট চালিয়ে ছুটে চললো জাভেদ।

অন্ধকার হলেও বেশ স্পষ্ট দেখাচ্ছিলো নদীবক্ষের নৌকাগুলো।

বজরা নিয়ে বেশ দূরে ওরা চলে গিয়েছিলো।

জাভেদ তীরবেগে ছুটলো বজরা অভিমুখে।

মোটরবোরখানা অল্প সময়ে পৌঁছে গেলো বজরাখানার নিকটে।

জাভেদ যা সন্দেহ করেছিলো তাই ঠিক। বজরা থেকেই ভেসে আসছে নারীকণ্ঠের আর্তনাদ।

মোটরবোটখানা জাভেদ বজরার কোল ঘেঁষে নিয়ে আসে এবং মুহূর্ত বিলম্ব না করে লাফিয়ে পড়ে বজরার উপরে।

জাভেদ বজরায় লাফিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পায় বজরার ভিতরে একজন জোয়ান পুরুষ একটা তরুণীকে জোরপূর্বক কাঁধে তুলে নেবার চেষ্টা করছে।

অপর দুজন তরুণী বাঁচাও বাঁচাও বলে আর্তচিৎকার করছে।

মাঝিদের সামনে পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে আছে একটা জোয়ান লোক।

প্রথমে জাভেদ আক্রমণ করলো পিস্তলধারী লোকটাকে।

লোকটা ওদিকে মুখ করে ছিলো।

জাভেদ পেছন থেকে জাপটে ধরলো পিস্তলধারীকে এবং পিস্তলসহ হাতখানা মোচড় দিয়ে পিস্তলখানা ফেলে দিলো নদীর পানিতে।

লোকটা পেছন থেকে আক্রান্ত হওয়ায় হকচকিয়ে গিয়েছিলো। কিছু বুঝবার পূর্বেই জাভেদ তাকে প্রচন্ড এক ঘুষি দিয়ে ফেলে দিলো নদীতে। তারপর জাভেদ বজরার ভিতর প্রবেশ করলো।

হঠাৎ এক ব্যক্তিকে বজরার মধ্যে প্রবেশ করতে দেখে যে লোকটা তরুণীটাকে জোরপূর্বক কাঁধে তুলে নেবার চেষ্টা করছিলো সে তরুণীকে মুক্ত করে দিয়ে ক্রুদ্ধ জানোয়ারের মত জাভেদের দিকে লক্ষ্য করে দাঁড়ালো।

জাভেদের চোখেমুখেও হিংস্রভাব ফুটে উঠেছে।

যদিও বজরার মধ্যে নীলাভ আলোর ঝাড় ঝুলছিলো তবু তার আলো তেমন স্পষ্ট নয়।

জাভেদ লোকটাকে এবং তরুণীটাকে ভালভাবে দেখতে পাচ্ছে না তবু সে বিলম্ব না করে আক্রমণ করে বসলো লোকটাকে।

শুরু হলো ভীষণ ধস্তাধস্তি।

আলোর ঝাড় খসে পড়লো।

আগুন ধরে গেলো বজরায়।

তরুণীগণ হাউমাউ করে কেঁদে অস্থির।

ওদিকে তুমুল লড়াই চলেছে।

ঝাড়বাতির আগুনে বজরায় দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠলো।

মাঝিগণ যে যেদিকে পারলো নদীতে লাফিয়ে জীবন রক্ষা করার চেষ্টা করলো।

নরপশুটাকে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেললো জাভেদ, তারপর মুখে একটা রুমাল খুঁজে বজরার মেঝেতে উবু করে ফেলে এগিয়ে গেলো তরুণীদের দিকে।

তিনজন তরুণী জড়োসড়ো হয়ে আর্তনাদ করছে।

জাভেদ এক একজনকে ধরে বজরা থেকে মোটরবোটে ছুঁড়ে ফেলে দিলো। তারপর তৃতীয় জনকে নিয়ে লাফিলে পড়লো বজরা থেকে মোটরবোটে।

ততক্ষণে জৌলুসেভরা বজরাখানা ভীষণভাবে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে। জাভেদ উচ্ছ্বসিতভাবে হেসে উঠলো হাঃ হাঃ হাঃহাঃ হাঃ হাঃ

বজরার আগুনের লেলিহান শিখার দীপ্ত আলোকে জাভেদ ফিরে তাকালো তরুণীদের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললো সে–রাজকুমারী তুমি!

লজ্জায় জড়োসড়ো হয়ে ভীত কম্পিত কণ্ঠে বললো রাজকুমারী আমাকে ক্ষমা করে দাও। আমাকে তুমি নদীতে নিক্ষেপ করোনা।

জাভেদ পুনরায় পূর্বের মত হেসে উঠলো।

দীপ্ত অগ্নিশিখার লাল আলোতে রাজকুমারী বিস্ময়ে হতবাক।

শুধু রাজকুমারী নয়, তার সঙ্গিনীদ্বয়ও ঝড়ের পাখির মত কাঁপছে।

একজন রাজকুমারীর কানে মুখ নিয়ে বললো–এক বিপদ থেকে উদ্ধার হলো কিন্তু এই বিপদ থেকে আমাদের উদ্ধার নেই। একে চিনতে পেরেছেন রাজকুমারী?

পেরেছি। এ সেই তরুণ যাকে আমি শাস্তি দেবে বলে রাজদরবারে হাজির করেছিলাম। আমাকে শাস্তি পেতেই হবে। তার সঙ্গে তোমাদের অবস্থাও করুণ। এখন পালাবার কোনো উপায় নেই।

জাভেদ বুঝতে পেরেছে ওরা ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে। চিনতে পেরেছে তাহলে ওরা।

জাভেদ হাসি থামিয়ে বললো–এবার রাজকুমারী, কে তোমাকে রক্ষা করবে?

রাজকুমারী জেবা করুণ কণ্ঠে বললো–তোমার উপর আমি অবিচার করেছিলাম মাফ করে দাও। তুমি যদি আমাদের তিন বান্ধবীকে রাজ্যে পৌঁছে দাও তাহলে তুমি বাবার কাছে যা চাইবে তাই পাবে।

বললো জাভেদ–যদি তোমাকে চাই?

আমাকে।

হাঁ, তাতেও রাজি হবে তোমার বাবা?

জেবা ভয়বিহ্বল চোখে তাকালো জাভেদের দিকে।

জাভেদ বললো–কি, জবাব দিচ্ছো না কেন? আগে তোমার মুখে শুনবো তারপর নিয়ে যাবো রাজপ্রাসাদে।

একজন তরুণী বলে উঠলো–রাজকুমারীর পরিবর্তে যদি আমাদের কাউকে দাবি করেন তাও আমরা রাজি আছি আপনার দাসীরূপে....

না, তা হয় না। আমি রাজকুমারী জেবাকেই চাই।

আচ্ছা, তাই হবে। করুণ অসহায় চোখে তাকালো জেবা জাভেদের মুখের দিকে।

লেলিহান অগ্নিশিক্ষায় জাভেদের মুখমন্ডল লালে লাল মনে হচ্ছিলো। জাভেদ বসলো। মোটরবোটের হ্যান্ডেল চেপে ধরে।

*

মহারাজ, এই নিন আপনার নন্দিনী আর তার সখীদ্বয়কে। জাভেদ তিনজন তরুণীকে নিয়ে হাজির করলো ঝাম রাজদরবারে।

এতক্ষণে মহারাজের মুখে হাসি ফুটলো। গতরাতে সমস্ত রাত জেগে কাটিয়েছেন তিনি। বজরাসহ রাজকুমারী গিয়েছিলেন সন্ধ্যাভ্রমণে, তারপর আর ফিরে আসেনি বজরাসহ রাজকন্যা এবং সখী দুজন।

সমস্ত রাজপ্রাসাদে একটা শোকের হাওয়া বয়ে যাচ্ছিলো।

রাজ্যের লোকজন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলো।

সবাই বজরার সন্ধানে ঝাম নদীতে চষে ফিরছিলো।

কয়েকজন মাঝি রাজ প্রাসাদে এসে জানিয়ে গেছে তারা নিজের চোখে দেখেছে ঝম নদীর মধ্যস্থলে একটা বজরা আগুনে জ্বলে–পুড়ে ছাই হয়ে যেতে।

কথাটা মহারাজের কানে যেতেই তিনি উন্মাদের মত হয়ে পড়েন, কারণ একমাত্র কন্যা জেবাই তার হৃদয়ের ধন নয়নের মনি। সন্ধ্যাভ্রমণে প্রতিদিন যেমন

যায় তেমনি আজও সে গিয়েছিলো কিন্তু এমন ঘটনা ঘটবে ভাবতেও পারেননি মহারাজ।

সন্ধ্যা গত হয়ে গেলেও যখন রাজকুমারী জেবা বজরায় ফিরে এলো না, তখন ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়েন মহারাজ। মা–হারা কন্যার তিনিই মাতা–পিতা উভয়ই।

তাই ভাবনাও সব তাঁকেই ভাবতে হচ্ছে।

এক্ষণে মহারাজ কন্যা এবং তার বান্ধবীদ্বয়কে সেই তরুণের সঙ্গে দেখে এবং তাদের উদ্ভ্রান্ত চেহারা দেখে ভীষণ বিস্মিত হলেন।

দুচোখে বিস্ময় নিয়ে বললেন মহারাজ–একি, তোমরা কোথা থেকে এলে? তোমাদের এ অবস্থা কেন?

রাজকুমারী জেবা কিছু বলতে যাচ্ছিলো জাভেদ বললো–যদি আদেশ করেন তাহলে আমি বলছি।

মহারাজ হৃষ্ট চিত্তে বললো–নিশ্চয়ই বলো? বলো কোথায় কেমন করে আমার জেবাকে পেলে তুমি?

জাভেদ সংক্ষিপ্তভাবে সব কথা বললো, আরও বললো রাজকুমারী তাকে কথা দিয়েছে আমার পিতার নিকটে যা চাইবেন তিনি তাই দেবেন।

হাঁ, তা সত্যি বাবা। আজ তুমি আমার কন্যার ইজ্জত রক্ষা করে তাকে পৃথিবীর বুকে বেঁচে থাকার অধিকার দিয়েছো ঝাম রাজ্যের সম্মান তুমি রক্ষা করেছে বিদেশী তরুণ। বলো তুমি কি চাও? যা চাইবে আমি তাই দেবো। এমন কি যদি তুমি রাজকুমারী জেবাকে বিয়ে করতে চাও আমি প্রফুল্ল মনে তাই দেবো। তোমাকে আমি বিমুখ করবো না তরুণ।

এবার জাভেদ হেসে উঠলো ঠিক বনহুরের মত অদ্ভুত সে হাসি।

হতবাক চোখে জেবা তাকিয়ে আছে জাভেদের মুখের দিকে, ওকে বড় আশ্চর্য লাগছে তার কাছে। ও এমন করে হাসছে কেন? যা সে চেয়েছিলো বা যা সে দাবি করেছিলো তাই মহারাজ দেবেন জানতে পেরেই হাসছে তরুণ।

বড় অদ্ভুত ছেলেটা।

জেবার বান্ধবীদের চোখেমুখেও বিস্ময়।

না জানি তরুণ কি জবাব দেবে।

নিশ্চয়ই সে খুশি হয়েছে মহারাজের কথায়।

যা সে দাবি করেছিলো তাই পূর্ণ হতে চলেছে। রাজকুমারী জেবাকে লাভ করা সহজ কথা নয়। শুধু অপূর্ব সুন্দরীই সে নয়, বিশাল রাজ্যের অধিকারিণী। পিতার পরে ঝামরাজ্য তার।

হাসি থামিয়ে বললো জাভেদ–না চাইতেই বরিষণ। অপূর্ব সুযোগ। কিন্তু আমি আপনার দান গ্রহণ করতে অক্ষম মহারাজ।

মহারাজ বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললেন–তরুণ!

হাঁ মহারাজ।

রাজদরবারের যত পরিষদ ছিলেন সবাই ভেবেছিলেন তরুণ মহাভাগ্যবান। রাজকুমারীকে পাওয়া মানে এক পরম সম্পদ লাভ করা। একটি ফুলের মত সুন্দর জেবা, তা ছাড়া ঝামরাজ্যের ভবিষ্যত রাণী। তরুণ ভাগ্যবান হয়েও নিজের ললাটে করাঘাত করলো। সবাই অবাক হয়ে গেলো মুহূর্তে। এমন কি জেবা নিজেও বিস্মিত হতভম্ব, বান্ধবীদ্বয় মুখ চাওয়া–চাওয়ি করলো।

মহারাজ বললেন–এ তুমি কি বলছো? জেবাকে তুমি গ্রহণ করতে চাও না?

জেবার যোগ্য আমি নই মহারাজ।

তরুণ, তোমার চেহারা এবং ব্যবহার আমাকে মুগ্ধ করেছে। শুধু মুগ্ধই আমি নই–অভিভূত। তোমাকে আমি রাজকুমার করে চিরদিন ঝামরাজ্যে ধরে রাখতে চাই।

আপনি আমার দাবি পূরণে রাজি আছেন এটাই আমার পাওয়া। রাজকুমারীকে আমি বিয়ে করতে পারি না কারণ আমি কোনো রাজকুমার নই।

বলেছি তো তোমাকে রাজকুমার বানাতে চাই। তোমার মধ্যে রাজকুমারের যা গুণাগুণ সব আমি দেখতে পাচ্ছি।

আমি অক্ষম মহারাজ।

তবে কি চাও বলো?

ঝামরাজ্যের যত দুঃস্থ অসহায় লোক আছে আপনি তাদের মধ্যে প্রতিদিন খাদ্য বিতরণ করবেন যেন তারা খাদ্যাভাবে মারা না যায়। এই আমার দাবি রইলো আপনার কাছে।

তরুণ, তোমার দাবি আমি মাথা পেতে গ্রহণ করলাম। আজ থেকে আমি রাজ্যের যত সম্পদ আছে প্রজাদের জন্য অকাতরে বিলিয়ে দেবো এই হলো আমার কর্তব্য।

জাভেদ বললো চলি মহারাজ।

মহারাজকে কুর্ণিশ জানিয়ে পরে জেবাকে কুর্ণিশ জানালো জাভেদ, তারপর দীপ্ত পদক্ষেপে বেরিয়ে গেলো সে রাজপ্রাসাদ থেকে।

রহমান এতক্ষণ হন্তদন্ত হয়ে তাকে খুঁজে ফিরছিলো। এতক্ষণে জাভেদকে ফিরে আসতে দেখে সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো।

বললো রহমান–কোথায় গিয়েছিলে ছোট সর্দার? কাল সন্ধ্যার পূর্বে গেলে আর ফিরে এলে আজ সূর্য যখন মাথার উপরে।

আমি কি কচি খোকা তাই হারিয়ে যাবার ভয় ছিলো।

হারিয়ে না গেলেও নানা বিপদ–আপদ তো আছে। হঠাৎ কাউকে কিছু না বলে যাওয়া ঠিক হয়নি ছোট সর্দার।

কোনটা ঠিক আর না ঠিক আমি বুঝতে শিখেছি রহমান চাচা। জাভেদ কথাটা গম্ভীর কণ্ঠে বললো। তারপর বললো–আজই আমরা কান্দাই অভিমুখে রওয়ানা দেবো। দলবলকে প্রস্তুত হবার জন্য নির্দেশ দাও রহমান চাচা।

আচ্ছা তাই হবে।

বললো রহমান, তারপর সে চলে গেলে নিজের লোকজনদের জানাতে।

ঠিক বিদায় মুহূর্তে অশ্বের সামনে এসে দাঁড়ালো রাজকুমারী।

অবাক কণ্ঠে বললো জাভেদ–তুমি।

হাঁ আমি। আমি তোমাকে যেতে দেবো না বিদেশী যুবক।

জেবার কথা শুনে হেসে উঠলো জাভেদ।

ভাগ্যিস তখন সেখানে রহমান বা তার অনুচরগণ ছিলো না। তারা অন্য জায়গায় প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছিলো।

জাভেদ তার অশ্ব নিয়ে রওয়ানা দেবে।

সঙ্গে রহমান থাকবে তার অশ্ব নিয়ে।

অন্যান্যরা যাবে যানবাহন নিয়ে সাধারণ মানুষের বেশে।

পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে জেবা।

জাভেদ হাসি থামিয়ে বললো–হঠাৎ তোমার এ মত কেন? আবার বুঝি আটক করতে চাও?

হাঁ, তোমাকে আটক করতে চাই।

আমার অপরাধ?

কেন তুমি আমাকে রক্ষা করতে গিয়েছিলে? কেন তুমি মহত্ত্ব দেখাতে গিয়েছিলো সেদিন বলো?

ও তাই বুঝি আমি অপরাধী?

হাঁ, তুমি আমাকে সেদিন উদ্ধার করে আমার মন চুরি করে নিয়েছে। এ তোমার অপরাধ। আমি তোমাকে যেতে দেব না যুবক!

রাজকুমারী, এত সহজে তুমি মুষড়ে পড়বে তা জানতাম না। তোমাকে আমি কঠিনপ্রাণ নারী মনে করেছিলাম কিন্তু তুমি দেখছি ফুলের চেয়েও কোমল।

যা খুশি বলো তবু আমি তোমাকে যেতে দেবো না।

যা সম্ভব নয় তা নিয়ে বাড়াবাড়ি করা রাজকুমারীর শোভা পায় না।

আমি তোমাকে অনুনয় করছি।

অক্ষম রাজকুমারী, আমি অক্ষম।

তুমি এত কঠিন। আমার ভালবাসা তুমি উপেক্ষা করছ।

তুমি আমাকে জানো না বলেই এ কথা বলছো রাজকুমারী। আমি শুধু কঠিন নই; পাথরের চেয়েও শক্ত। আচ্ছা, আবার দেখা হবে যদি কোনোদিন ঝামরাজ্যে আসি।

কথাটা বলে জাভেদ নিজ অশ্বচালনা করে।

রাজকুমারী জেবার দুচোখে বিস্ময় রাগ অভিমান। হতবাক হয়ে চেয়ে থাকে জাভেদের চলে যাওয়া পথের দিকে।

*

মিঃ হারুনের গাড়ি এসে থামলো মিঃ শংকর রাওয়ের বাসার সামনে। রাত তখন একটা বাজে।

এত রাতে পুলিশপ্রধানের গাড়ি ডিটেকটিভ শংকর রাওয়ের ভবনে তেমন আশ্চর্যকর কিছু না হলেও একটু বিস্ময়কর বটে। কারণ ঐ দিনই বহুক্ষণ উভয়ের মধ্যে আলোচনা চলেছে, তারপর এত রাতে হঠাৎ আবার উভয়ের মিলন ব্যাপার যেন রহস্যজনক বলে মনে হলো।

গাড়ি রেখে মিঃ হারুন উঠে গেলেন উপরে।

পায়চারী করছিলেন শংকর রাও।

তিনি বেশ কিছুটা উত্তেজিতভাবেই পায়চারী করছিলেন। হাতে একখানা কাগজ ছিলো, বারবার তিনি কাগজখানা মেলে ধরছিলো চোখের সামনে।

মিঃ হারুন কক্ষে প্রবেশ করতেই মিঃ শংকর রাও তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন।

দুজন দুটো আসনে বসে পড়লেন।

বললেন মিঃ শংকর রাও–এ কথা কি সত্য যে, স্বয়ং দস্যু বনহুর সিন্ধি পর্বতে যাবে মিস মতিবাঈকে উদ্ধার করতে

হাঁ, এ কথা আমাদের গোপন ওয়্যারলেসে ধরা পড়েছে। আর ধরা পড়েছে মিস মতিবাঈকে উদ্ধার করার পর সে নিজে তাকে পৌঁছে দিতে যাবে ভৌমবাড়িতে। কথাগুলো বলে থামলেন মিঃ হারুন।

শংকর রাও গম্ভীর কণ্ঠে বললেন–অত্যন্ত সাবধানে কাজ করতে হবে। যেন কোনোক্রমে মিঃ নূর টের না পায়। দস্যু বনহুর আমাদের বারবার নাকানি চুবানি খাইয়েছে, এবার তার সন্তানকে দিয়ে তাকে কাবু করাবো।

কিন্তু বনহুরকে পাকড়াও করা কি এত সহজ হবে?

হবে বলেই মনে করি। তবে অসীম ধৈর্যের প্রয়োজন আছে কথাটা বললেন মিঃ হারুন।

পুলিশবাহিনী সজাগ দৃষ্টি রেখেছে সিন্ধি পর্বতের দিকে।

যে কোনো পথে কেউ পর্বতের পাশে পৌঁছলে আমাদের পুলিশ তাকে দেখে ফেলবে।

এ ছাড়া আমাদের ক্যামেরা কাজ করছে। বহুদূর এক গোপন স্থানে আমাদের ক্যামেরা বসানো রয়েছে। বললেন মিঃ হারুন।

শংকর রাও বললেন–বনহুর স্বয়ং তাহলে মিঃ ভৌমের কন্যাকে উদ্ধারে আত্মনিয়োগ করেছে, কি বলেন?

হাঁ, এটা ঠিক এবং এ সংবাদ অত্যন্ত রহস্যজনকভাবে সংগ্রহ করা হয়েছে। বললেন মিঃ হারুন। একটু থেমে বললেন তিনি–মিঃ ভৌমের বাড়িতে যেদিন

বনহুর মিস মতিবাঈকে পৌঁছাতে যাবে সেদিন তাকে গ্রেপ্তার করতে হবে।

শংকর রাও গম্ভীর কণ্ঠে বললেন–তাকে গ্রেপ্তার করা বড় শক্ত কাজ। কৌশলে কাজ করতে

হাঁ, একটা কৌশল আমরা এঁটেছি এবং সে কথাগুলো নিয়ে আলোচনার জন্যই আজ এ মুহূর্তে আপনাকে ফোন করেই চলে এলাম।

কিন্তু আরও একটা সংবাদ আছে যা এখনও বলা হয়নি আপনাকে, আপনার অপেক্ষা করছিলাম। ব্যাপার অত্যন্ত রহস্যজনক এই দেখুন। কথাটা বলে মিঃ শংকর রাও একটা চিঠি মিঃ হারুনের হাতে দেন।

মিঃ হারুন চিঠিখানা নিয়ে মেলে ধরলেন চোখের সামনে। মাত্র কয়েক লাইন লেখা আছে চিঠিখানাতে।

শংকর রাও বললেন–পড়ুন, আমিও শুনবো যদিও আমি বেশ কয়েকবার পড়েছি।

মিঃ হারুন চিঠিখানা পড়তে শুরু করলেন–মা, আমি মতিবাঈ লিখছি; বাবার মৃত্যু ঘটলেও তার কোটি টাকা ব্যাংকে আছে। এ ছাড়াও তার প্রচুর সম্পদ আছে। আমি তোমার একমাত্র সন্তান। আমাকে যদি ফিরে পেতে চাও তাহলে পঞ্চাশ লাখ টাকা তুমি মিঃ শংকর রাওয়ের হাতে সিন্ধি পর্বতের উত্তরে ছোট্ট একটা গুহা আছে, ঐ গুহার মধ্যে রেখে যেতে বলল। তাহলে আমাকে তোমরা ফেরত পাবে।

একবার দুবার তিনবার পড়লেন মিঃ হারুন। তারপর তিনি বললেন– এ চিঠি কি করে আপনার নিকট পৌঁছলোর

সে এক বিস্ময়কর ব্যাপার। আমার টেবিলে দৈনিক সংবাদপত্র ভাঁজ করা ছিলো, চিঠিখানা তারই মধ্যে পেয়েছি।

চিঠিখানা তো দেখছি মিস মতিবাঈ তার মায়ের কাছে লিখেছেন। অথচ আপনার টেবিলে দৈনিক সংবাদপত্রের মধ্যে সে চিঠি....

হাঁ, তাই তো আমি বেশি অবাক হয়েছি। একটু থেমে বললেন শংকর রাও– চিঠিখানা মতিবাঈ তার মাকে লিখলেও তা আমার নিকট পাঠানোর কারণ, ও

টাকা যেন আমিই তাদের নিকট হতে দেবার ব্যবস্থা করি।

মিঃ হারুন বললেন–আপনি এ ব্যাপারে মিসেস ভৌমের সঙ্গে আলাপ করেছেন কি?

না, এখনও করিনি। এ চিঠিখানা সন্ধ্যায় আমার নজরে পড়েছে। একটু থেমে বললেন শংকর রাও–আমি ভাবছি কাল সকালে মিসেস ভৌমের সঙ্গে এ ব্যাপার নিয়ে আলাপ–আলোচনা করবো।

হাঁ, তাই শ্রেয়, কারণ, মিসেস ভৌম কন্যার জন্য ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। সব সময় হন্তদন্ত হয়ে পুলিশ অফিসে ছুটাছুটি করছেন।

তা করবেনই, বেচারী স্বামীকে হারিয়ে পাগলিনী প্রায় হয়ে পড়েছেন, তারপর একমাত্র কন্যাকেও হারাতে বসেছেন। কন্যা জীবিত আছে কিনা তাও জানেন না। যাক, এ চিঠিখানা প্রমাণ করছে মিস মতিবাঈ জীবিত আছে।

এ চিঠিখানা মিস মতিবাঈয়ের লেখা কিনা এটা প্রথমে জানতে হবে। গম্ভীর কণ্ঠে বললেন মিঃ হারুন।

আপনি ঠিক বলেছেন, এ চিঠিখানা মিস মতি বাঈয়ের কিনা তা জানা দরকার এবং তা একমাত্র প্রমাণ করতে পারবেন মিসেস ভৌম। তার কন্যার হাতের লেখা তিনি ঠিকই চিনবেন বলে আশা করি। কথাগুলো বলে চিঠিখানার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন মিঃ শংকর রাও।

সেদিন নানা ধরনের আরও কিছু গোপন আলাপ–আলোচনা হলো দুই পুলিশপ্রধান কর্মকর্তার মধ্যে।

তারপর বিদায় গ্রহণ করলেন মিঃ হারুন।

*

পরদিন মিঃ শংকর রাও এবং মিঃ হারুন দুজন সহকারী নিয়ে হাজির হলেন মিঃ ভৌমের বাড়িতে। এতবড় এক দুর্ঘটনা ঘটে যাবার পর এ বাড়ির শান্তি যেন চিরতরে হারিয়ে গিয়েছিলো। একটা থমথমে ভাব সদা বিরাজমান এই বাড়িতে।

বিশেষ করে বাড়ির মালিক নিহত হওয়ায় এবং একমাত্র কন্যা চুরি হওয়ায় বাড়ির শান্তি চিরতরে লোপ পেয়ে গিয়েছিলো।

এ বাড়ির দুর্ঘটনা ঘটে যাবার পর এ বাড়িতে পুলিশ প্রধানদের আনাগোনা অব্যাহত ছিলো, তাই মিঃ শংকর রাও এবং হারুনের আগমনে তেমন করে কেউ আশ্চর্য হলো না।

মিঃ শংকর রাও জানালেন তারা মিসেস ভৌমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন।

মিঃ শংকর রাও এবং মিঃ হারুন আসন গ্রহণ করে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন মিসেস ভৌমের জন্য।

কিছুক্ষণের মধ্যেই এলেন মিঃ ভৌমের পত্নী মিসেস ভৌম। শুভ্রকেশী বিশালদেহী মহিলা রুমালে চোখ মুছতে মুছতে হলঘরে প্রবেশ করলেন।

মিঃ শংকর রাও এবং মিঃ হারুন উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলেন।

বসুন মিসেস ভৌম। বললেন মিঃ শংকর রাও।

মিসেস ভৌম আসন গ্রহণ করে বললেন–কিছু জানার জন্য এসেছেন বুঝি? কিন্তু কত আর বলবো–বললে কিছু হবে না।

আজ আপনাকে তেমন কিছু বিরক্ত করবো না। শুধু একটা প্রশ্ন করবো....কথাটা অর্ধসমাপ্ত রেখেই পকেট থেকে একটা ভাজকরা কাগজ বের করে মেলে ধরলেন মিসেস ভৌমের সামনে–দেখুন দেখি এ চিঠিখানা কি আপনার কন্যা মিস মতিবাঈয়ের লেখা?

কোনো দ্বিধা না করে বললেন, মিসেস ভৌম–হাঁ, এ হাতের লেখা আমার মতি মায়ের। দেখি দেখি কি লিখেছে আমার মা মনি?

দেখুন এ চিঠি আপনাকেই লেখা হয়েছে। চিঠিখানা মিসেস ভৌমের হাতে দিলেন মিঃ শংকর রাও।

মিসেস ভৌম চিঠিখানা হাতে নিয়ে গভীর মনোযোগ সহকারে পড়লেন, তারপর রুমালে চোখ মুছে বললেন–এর চেয়ে বেশি টাকা চাইলে আমি তাই দিতাম। তবু আমার মনিকে আমি ফেরত চাই। আপনারা আমার মতিকে ফেরত নিয়ে আশার চেষ্টা করুন। টাকা যত লাগে নিয়ে যান, আমি আমার যথাসর্বস্ব দিতে রাজি আছি রুমালে চোখ মোছেন মিসেস ভৌম।

চিঠিখানা যে মিস মতিবাঈয়ের লেখা তাতে কোনো সন্দেহ থাকে না।

মিঃ শংকর রাও এবং মিঃ হারুন বিদায় গ্রহণ করেন। তারা বুঝতে পারেন মিস মতিবাঈ সিন্ধি পর্বতের অভ্যন্তরে রয়েছে।

*

জাভেদ ফিরে এসেছে।

আনন্দে আত্মহারা নূরী, কারণ সন্তানের জন্য সে ভীষণ চিন্তিত ছিলো। শুধু নূরীই নয়, আশাও কম চিন্তিত ছিলো না। একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা তার হৃদয় ব্যথিত করে তুলছিলো। আশা বড় স্নেহ করতো ওকে।

আশার নিজের কোনো সন্তান নেই।

সে আজও বিয়ে করেনি, শুধু সে ভালবেসেছিলো একজনকে–সে হলো স্বয়ং দস্যু বনহুর। তাকে ভালবেসে নিজেকে আশা নিঃশেষ করে দিয়েছে, তার প্রতিদানে বনহুরের কাছে সে কিছু। চায়নি।

আশা নিজেও দস্যুতা করতো।

তার ভয়েও একদিন সারা দেশ প্রকম্পিত ছিলো কিন্তু আশা যেদিন থেকে বনহুরকে দেখলো, তার প্রতি আকৃষ্ট হলো তখন থেকে তার সেই দুর্দমনীয় মনোভাব যেন অনেকটা শান্ত হয়ে গেলো। একটা সুন্দর কোমল মনের জন্ম ঘটলো আশার অন্তরে।

আশা দস্যু বনহুরকে পাবার জন্য উন্মাদ হয়ে উঠেছিলো। সর্বক্ষণ সে বনহুরকে ছায়ার মত অনুসরণ করতো। ওর স্বপ্ন ধ্যান জ্ঞান যেন বনহুর। অনেকদিন আশা তার অজ্ঞাতেই ভালবেসে গেছে। বনহুর প্রথম প্রথম জানতেও

পারেনি একটা নারী তাকে দূর থেকে ভালবেসে যাচ্ছে। কিন্তু একদিন বনহুর সব জানতে পারলো, এবং অতি নিকটে পেলো তাকে।

আশার মনে সেদিন অনেক বাসনাই উঁকি দিয়েছিলো কিন্তু সে বুঝতে পারলো বনহুরকে সে কোনদিন পাবে না। বনহুর তার কাছে দিন দিন আকাশের চাঁদের মত নির্মল পবিত্র থাকবে। চাঁদের আলো যেমন পৃথিবীর অন্ধকার বুককে দীপ্তময় করে তোলে, তেমনি বনহুরের সৌন্দর্য তাকে অভিভূত ও মুগ্ধ করে। বহুবার তাই আশা বনহুরকে মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচিয়েছে।

আশার এ ঋণের কথা বনহুর তেমন করে কোনোদিন ভাবেনি–ভেবেছে নূরী এবং তার জন্য নিজের সন্তানকে নুরী তুলে দিয়েছে আশার হাতে।

আশা নূরীর এ দান উপেক্ষা করতে পারেনি। সে জাভেদকে মাতৃস্নেহে বুকে টেনে নিয়েছে।

সেই জাভেদের এতটুকু অমঙ্গল চিন্তা আশা করতে পারে না। আজ কদিন জাভেদ দেশ ছেড়ে গিয়েছে, আশার হৃদয় দুশ্চিন্তায় ভরে উঠছিলো। সব সময় সে দয়াময়ের কাছে প্রার্থনা করতো, যেন জাভেদ ভালভাবে সুস্থ দেহে ফিরে আসে।

জাভেদ ফিরে এসেছে।

এই আনন্দ যেন আশা নিজের মধ্যে ধরে রাখতে পারছিলো না, জাভেদকে কাছে ডেকে নিয়ে বললো–কেমন ছিলে জাভেদ

ভালো ছিলাম আশা আম্মু।

আমরা কিন্তু তোমার জন্য বড় চিন্তিত ছিলাম।

তুমি ঠিক আম্মির মত হয়ে পড়েছো, এতটুকুতেই বড় ভাবো। জানো আশা আম্মু, সেখানে দুঃস্থ মানুষের মধ্যে যখন ঐ সামগ্রীগুলো বিলিয়ে দিচ্ছিলাম তখন কি যে খুশি লাগছিলো আমার....

জাভেদ বলে যাচ্ছে, তখন আশার মনের পর্দায় ভাসছে আর এক দিনের স্মৃতি। বনহুর এমনি করে কান্দাইয়ের দুঃস্থ মানুষগুলোর মধ্যে দাঁড়িয়ে যখন

তাদের হাতে খাবার তুলে দিচ্ছিলো তখন তাদের মধ্যে কি এক বিপুল আনন্দ উচ্ছ্বাস বয়ে যাচ্ছিলো।

বনহুরকে আশা দেখেছে তখন নতুন এক রূপে।

সে এক অপূর্ব দীপ্ত বলিষ্ঠ মুখ....

কি ভাবছো আশা আম্মু

কিছু না।

জানি তুমি ভাবছো আমি কত আনন্দ পেয়েছি; কত খুশি হয়েছি সেদিন।

হাঁ, সত্যি তুমি কত খুশি হয়েছিলে বাবা।

দস্যুতার চেয়ে দানে এত আনন্দ আমি আগে বুঝিনি।

এমন সময় বনহুর সেখানে এসে দাঁড়ালো।

জাভেদ কুর্ণিশ জানিয়ে সরে দাঁড়ালো একটু।

বনহুর বললো–তোমার আশা আম্মুর দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করো জাভেদ। আমি জানতে পারলাম ফিরোজা শহরে এক ডাক্তার আছেন, তিনি বহু অন্ধের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছেন।

এ কথা সত্য?

হ্যাঁ জাভোদ। তুমি কালকেই তোমার আশা আম্মুকে নিয়ে ফিরোজায় চলে যাও। আমি জানি তোমার আশা আম্মু দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবে।

বেশ, আমি তা ই করবো বাপু।

এমন সময় নূরী এসে দাঁড়ালো সেখানে–জাভেদ ছেলেমানুষ, বরং তুমিই যাওনা হুর ওকে নিয়ে?

আমার যাবার উপায় নেই নূরী, নাহলে আমিই যেতাম আশাকে নিয়ে বললো বনহুর।

নূরী বললো—-কেন উপায় নেই।

তুমি হয়তো শুনে থাকবে কান্দাই শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তি মিঃ ভৌম নিহত হয়েছেন এবং তার একমাত্র কন্যা মিস মতিবাঈকে হত্যাকারীরা চুরি করে নিয়ে গিয়ে আটক করে রেখেছে। তার বিনিময়ে বেশ কিছু মোটা টাকা দাবি করে বসেছে। এই দুস্কৃতিকারীরা দস্যু বনহুর নাম নিয়ে কাজ করে চলেছে।

হাঁ, আমি সব শুনেছি। আরও শুনেছি তারা সিন্ধি পর্বতের কোনো এক গোপন জায়গায় আত্মগোপন করে উদ্দেশ্য হাসিল করে যাচ্ছে। আমি এই নরপশুদের মূল শিকড় উপড়ে ফেলতে চাই এবং চলেছে জানে তা কত কঠিন কাজ। আর সেই কারণেই আমি যেতে পারছি না কোথাও।

কিন্তু এই কাজ যে বড় কঠিন হুর। সিন্ধি পর্বতের অভ্যন্তরে আত্মগোপন করে যারা দীর্ঘকাল কু কর্ম করে চলেছে তাদের ধ্বংস করা মুস্কিল।

আশা এতক্ষণ সব শুনছিলো, এবার সে বললো–আমার জন্য ভাবতে হবে না। চোখ আমার অন্ধ থাক। বনহু, তুমি তোমার কাজে জাভেদকে সঙ্গে নাও।

না, জাভেদকে দরকার হবে না। ও তোমাকে নিয়ে ফিরোজায় চলে যাক। যত অর্থ লাগে আমি দেবো তবু তোমার দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসুক আমি তাই চাই। কথাগুলো বলে বনহুর চলে গেলো।

*

রহমান আর বনহুর এসে বসে ছিলো অদূরে একটা টিলার উপরে। কোনো এক গোপন ব্যাপার নিয়ে আলোচনা চলছিলো সর্দার আর সহকারী মিলে।

এমন সময় নূপুরের শব্দ, ভারী সুমিষ্ট ঝংকার।

বনহুর আর রহমান কান পাতলো।

বললো বনহুর–নূপুরের শব্দ না?

হাঁ সর্দার।

এ শব্দ কোথা থেকে আসছে?

আমি নিজেও বুঝতে পারি না এ শব্দ কোথা থেকে আসে। তবে প্রায়ই শোনা যায় এ শব্দ ...

চলো আমি নিজে যাবো। বনহুর উঠে দাঁড়ালো।

রহমান আর বনহুর এগুতে লাগলো নূপুরের শব্দ লক্ষ্য করে।

নূপুরের শব্দ আকর্ষণ করছে।

কি অপূর্ব।

আরও এগিয়ে গেলো বনহুর।

কিন্তু একি, কোথা থেকে শব্দটা আসছে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না যতই এগোয় তারা শব্দটা ক্রমে ক্ষীণতর হয়ে আসে।

একেবারে থেমে যায়।

বনহুর আর রহমান থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো।

বললো বনহুর–আশ্চর্য।

হা সর্দার, আশ্চর্য বটে।

এ নূপুরের শব্দ কোথা থেকে এলো, আবার না বুঝতে বুঝতেই মিলিয়ে গেলো।

এমনি বহুদিন আমরা শুনতে পেয়েছি কিন্তু দেখতে পাইনি বা জানতে পারিনি কিছু।

রহস্যময় বটে।

হাঁ সর্দার।

ফিরে আসে বনহুর আর রহমান।

নূপুরের শব্দ নিয়ে বেশিক্ষণ ভাবনার সময় তাদের ছিলো না। তারা নিজ নিজ অশ্বপৃষ্ঠে চেপে বসলো। ফিরে এলো আস্তানায়।

বনহুর বললো–আজ রাত দুটো মনে রেখো।

আচ্ছা সর্দার। বললো রহমান।

আস্তানায় প্রবেশ করতেই নূরী এগিয়ে এলো।

বনহুর বললো–জাভেদ আশাকে নিয়ে ফিরোজা অভিমুখে রওয়ানা দিয়েছে?

হাঁ, আজ সকালের প্লেনে আশা আর জাভেদ চলে গেলো।

বনহুর বললো–ওর দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসুক এটাই আমরা চাই।

হাঁ হুর, বেচারীর জন্য বড় মায়া হয়। ও বড় অসহায়, জীবনে কিছুই ও পেলো না।

একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে একমুখ ধোয়া ছেড়ে শয্যায় গা এলিয়ে দিলো বনহুর, বললো সে–আশা ভুল করেছে, তার জন্য দায়ী সে নিজে।

তার মানে?

মানে ইচ্ছা করলে আশা সব পারতো। রূপযৌবন–অর্থ সম্পদ সব ছিলো তার। সে বিয়ে করে বেশ সংসারধর্ম পালন করতে পারতো কিন্তু....

বলো থামলে কেন? নূরী বনহুরের জামার কিছু অংশ হাতের মুঠোয় চেপে ধরে বলে।

বনহুর সিগারেটটা এ্যাসট্রের উপরে ঝাঁকুনি দিয়ে ছাই ঝেড়ে নিয়ে বলে–কিন্তু সে ভুল করলো।

তোমাকে সে ভালবেসে ভুল করেছে বলতে চাও?

হাঁ।

কারণ?

কারণ তার জানা উচিত ছিলো....থাক শেষটা নাইবা শুনলে হয়তো তোমার কাছেও অপ্রিয় লাগবে।

হুর।

বলো?

তুমি কি?

আমি মানুষ।

জাভেদও তোমার মত নিষ্ঠুর হতে চলেছে।

মানে?

মানে সে ফুল্লরার মত মেয়েকে উপেক্ষা করে।

জানো তো নুরী, মনের উপর কারও হাত চলে না।

কিন্ত....

সব কিন্তু হার মানতে বাধ্য হয় ঐ এক জায়গায়, বুঝলে? যাক ওসব কথা। এবার শোন নতুন এক খবর।

বলো।

আমি আর রহমান বসেছিলাম গভীর জঙ্গলের মধ্যে একটা টিলার উপরে। হঠাৎ আমাদের কানে ভেসে এলো একটা সুমিষ্ট সুর নূপুরের ধ্বনি। নূপুরের ধ্বনি অনুসরণ করে আমি আর রহমান এগুলাম কিন্তু ব্যর্থ হলাম, সব মুছে গেলো আলেয়ার আলোর মত।

সত্যি?

হ নূরী।

তাহলে এই গভীর জঙ্গলে কে এলো নূপুর পায়ে।

আশ্চর্য বটে।

নূরী ভাবতে থাকে–তবে কি কোনো মায়াবী এসেছে তার স্বামীকে আকৃষ্ট করতে?

কি ভাবছো নূরী?

ঐ নূপুরের শব্দ নিয়ে ভাবছি। কে এসেছিলো এই গহন বনে নূপুরের ঝংকার তুলে কে জানে।

*

গভীর রাতে ঘুম ভেঙে যায় নূরীর।

বনহুরের শয্যা শূন্য দেখতে পায়। একটা দুশ্চিন্তা জেগে উঠে মনের আকাশে। তবে কি সেই নূপুরের শব্দ তার স্বামীকে আকৃষ্ট করে নিয়ে গেছে। একি তবে কোনো মায়াবিনীর হাতছানি কতদিন পর হুরকে পেয়েছে নূরী। আর ওকে কোথাও যেতে দেবে না সে।

নূরী শয্যা ত্যাগ করে বেরিয়ে এলো।

কান পেতে শুনতে চেষ্টা করলো, কোনো শব্দ কানে ভেসে আসে কিনা।

না, কোনো শব্দই শোনা যাচ্ছে না, কোনো নূপুরের ধ্বনিও ভেসে আসছে না।

ফিরে এলো নূরী পুনরায় তার ভূগর্ভ কক্ষে।

বনহুরের শূন্য বিছানায় হাত বুলিয়ে অনুভব করার চেষ্টা করলো স্বামীর সংস্পর্শ।

বনহুরকে নিয়ে যখন নূরী ভাবছে তখন বনহুর আর রহমান অশ্বপৃষ্ঠে ছুটে চলেছে গহন বন জঙ্গল পেরিয়ে সিন্ধি পর্বত অভিমুখে।

বনহুরের পিঠে একটা থলে রয়েছে, ঐ থলের মধ্যে রয়েছে ডিনামাইট। সিন্ধি পর্বতের কোনো এক গোপন স্থানে রয়েছে পর্বতের অভ্যন্তরে প্রবেশের পথ।

বনহুর আর রহমান ঐ পথে প্রবেশ করবে।

একটা ক্ষুদ্র টর্চ জ্বেলে মাঝে মাঝে একটা ম্যাপ দেখে নিচ্ছিলো বনহুর আর রহমান। ভারী সুন্দর ম্যাপখানা, সুস্পষ্টভাবে আঁকা রয়েছে সবকিছু।

ঐ ম্যাপখানাই তাদের পথের নির্দেশ দিচ্ছে।

রহমান বললো–সর্দার, এ ম্যাপখানা সঠিক পথের সন্ধান জানাচ্ছে তো?

হাঁ রহমান, এই ম্যাপ আমাদের ঠিক জায়গায় নিয়ে যাবে। এসো আমার সঙ্গে।

শুনেছি পুলিশবাহিনী সিন্ধি পর্বতের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছে।

হাঁ, সে কথা সত্য তবে আমরা পুলিশ বাহিনীর দৃষ্টি এড়িয়ে সিন্ধির অভ্যন্তরে প্রবেশ করবো।

কোনো ভুল হবে না তো?

একটু হেসে বললো বনহুর–একখানা হাত হারিয়ে তুমি দেখছি ভীতু হয়ে পড়েছে রহমান।

মোটেই না সর্দার, আমি মোটেই ভীতু হইনি। তবে ভয় হয় বহুদিন পর আপনি ফিরে এসেছেন আস্তানায়। আমাদের মনে পরম আনন্দ। আমরা নতুন প্রাণচাঞ্চল্য নিয়ে কাজ করে যাবো। আবার যদি আপনি কোনো বিপদে আটকা পড়েন তাহলে

ও, এবার বুঝেছি তোমার যত দুর্ভাবনা আমাকে নিয়ে।

সর্দার।

জানি রহমান, আমাকে পুলিশমহল তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়াচ্ছে, কারণ আমার নাম নিয়ে একদল নরপশু তাদের স্বার্থ সিদ্ধি করে যাচ্ছে।

শুধু পুলিশমহল নয়, নূরও পুলিশমহলের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। এখন সে বড় হয়েছে, তাই আমি নিজেও আর তার সঙ্গে দেখা সাক্ষাত করি না। কারণ কখন যে টের পেয়ে যাবে কে জানে।

হাঁ, নূর সন্ধান করে ফিরছে দস্যু বনহুরের। কথাটা বলে হাসলো বনহুর।

সর্দার দুজন জাঁদরেল পুলিশপ্রধান তাকে উস্কানি দিয়ে যাচ্ছে।

জানি তারা সন্তানকে দিয়ে পিতাকে পাকড়াও করতে চান। যা তাদের দ্বারা সম্ভব হয়নি তাই করতে চান কিন্তু…

সর্দার, একটা আলো দেখা যাচ্ছে। ঐ দেখুন মনে হচ্ছে টর্চলাইট জ্বেলে কেউ এদিকে কিছু খুঁজছে। হয়তো পুলিশের লোক।

কারা জানি না তবে মিত্র নয় এটা ঠিক। তাড়াতাড়ি আত্মগোপন করে ফেল।

রহমান এবং বনহুর একটা বড় টিলা ধরনের উঁচু পাথরের আড়ালে লুকিয়ে পড়লো।

দুজন লোক এগিয়ে আসছে।

তাদের একজনের হাতে টর্চ আছে। পথ দেখে এগিয়ে আসছে ওরা।

ওরা কারা?

কে জানে।

আড়ালে আত্মগোপন করে দেখতে লাগলো বনহুর আর রহমান।

নিকটে আসতেই দেখলো একজন বয়স্ক ব্যক্তি, অপরজন তরুণ এবং সে হলো নূর।

বনহুর চমকে উঠলো, এই দুর্গম স্থানে নূর এসেছে সন্ধান করতে দুস্কৃতিকারীর। কি ভয়ংকর দুঃসাহস হয়েছে ওর।

বললো রহমান–সর্দার, চিনতে পেরেছেন?

স্পষ্ট চেনা যাচ্ছে না তবু আন্দাজে বোঝা যাচ্ছে কোনো এক পুলিশ অফিসারের সঙ্গে রয়েছে নূর।

হাঁ সর্দার, ঠিক চিনতে পেরেছেন।

এই ভয়ংকর দুর্গম স্থানে রাত্রির শেষ প্রহরে নূর এসেছে। যে কোনো মুহূর্তে তার জীবন বিপন্ন হতে পারে। রহমান, তুমি যাও ওকে অনুসরণ করো যেন কোনো বিপদে না পড়ে।

আচ্ছা সর্দার।

নূর এবং তার সঙ্গী চলে গেছে বেশ দূরে।

রহমান সর্দারকে কুর্ণিশ জানিয়ে নূরকে অনুসরণ করলো।

*

বনহুর ঠিক জায়গায় পৌঁছে গেছে।

সিন্ধি পর্বতের অভ্যন্তরে প্রবেশের পথ সে খুঁজে পায় এবং সেই পথে সে বিস্ময়কর সুড়ঙ্গপথে ভিতরে প্রবেশ করে। অতি সহজে বিনা দ্বিধায় পৌঁছে যায় বনহুর সঠিক স্থানে।

একটি আধা অন্ধকার ভূগর্ভে বন্ধ করে রাখা হয়েছে মিস মতিবাঈকে। তার সামনে একটা টেবিল, টেবিলে কিছু শুকনো রুটি আর কিছু মাংস।

মতিবাঈ খাবার মুখেও দেয় না।

রোগা জীর্ণশীর্ণ হয়ে গেছে তার দেহ, চুলগুলো এলোমেলো।

পরিধেয় বস্ত্র মূল্যবান হলেও বেশ মলিন হয়ে গেছে।

একটা মোমবাতি জ্বলছে টেবিলে।

বনহুর মতিবাঈয়ের কাছাকাছি পৌঁছতে পেরেছে তার জন্য ভীষণ খুশি লাগছে তার। বেরিয়ে যাবার পথও পরিষ্কার করে রেখে এসেছে বনহুর। যে প্রহরীরা ঐ

রাস্তায় পাহারা দিচ্ছিলো তারা আর বাধা দিতে পারবে না, কারণ বনহুর তাদের হাত পা মুখ বেঁধে ফেলে রেখে এসেছে।

মিস মতিবাঈ ক্লান্ত অবসন্ন।

মাথাটা ঝুঁকে আছে সামনের দিকে।

চেয়ারে বসে বসে ধুকছে মতিবাঈ।

মাঝে মাঝে মাথাটা একটু উঁচু করে মোমবাতিটা দেখে নিচ্ছিলো মতিবাঈ। আবার তাকাচ্ছিলো ছায়াটার দিকে। এই নির্জন ভূগর্ভে ছায়াটাই যেন তার একমাত্র সাথী।

বনহুর আস্তে বেরিয়ে এলো আড়াল থেকে। মতিবাঈ চিৎকার করতে যাচ্ছিলো, বনহুরের দেহের জমকালো পোশাক তাকে ভীত করে তুলেছিলো। কে এই ব্যক্তি? বনহুর বিলম্ব না করে ওর মুখে হাতচাপা দিয়ে বলে উঠলো–আমি তোমাকে উদ্ধার করতে এসেছি।

অবাক চোখে তাকালো মতিবাঈ জমকালো পাগড়িতে মুখের নিচের অংশ ঢাকা বনহুরের মুখের দিকে।

বনহুর বললো–ভয় নেই, আমি তোমাকে তোমার মায়ের কাছে পৌঁছে দেবো। মোটেই বিলম্ব করো না মিস মতিবাঈ, কারণ আমি ডিনামাইট বসিয়ে দিয়েছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই ডিনামাইট বা হবে এবং এই ভূগর্ভ গোপন আড্ডা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে।

তুমি কে?

আমি তোমার উদ্ধারকারী, এর বেশি জানতে চেও না মিস মতিবাই।

এবার চলো তাহলে আমাকে নিয়ে।

চলো।

মিস মতিবাঈয়ের হাত ধরে দ্রুত ফিরে চলে দস্যু বনহুর।

এগুতেই সুড়ঙ্গে পড়ে থাকা হাত বাধা প্রহরীগুলোর সঙ্গে হোঁচট খায় মতিবাঈ, চমকে উঠে ভয়ে, বনহুর বলে–ওরা কিছু করতে পারবে না। তুমি দ্রুত চলতে থাকো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বেরিয়ে আসে বনহুর আর মতিবাঈ। পৃথিবীর মুক্ত বাতাসে মতিবাঈ প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিলো, কতদিন সে এমন মুক্ত বাতাস সেবন করেনি। কি ভয়ংকর দুর্গম স্থান সিন্ধি পর্বতের অভ্যন্তর।

মিস মতিবাঈ আধো অন্ধকারে তাকালো সঙ্গী জমকালো পোশাক পরা ব্যক্তিটার দিকে। নারী হৃদয় দুর্বর, তাই ভীত হলো সে, না জানি আবার কোন নতুন বিপদ এসে পড়লো তার জীবনে।

কি ভাবছো?

কিছু না।

বিলম্ব করো না, আমার সঙ্গে ঘোড়ায় চেপে বসতে হবে। পারবে তো?

পারবো। বললো মিস মতিবাঈ।

এ মুহূর্তে সে পারবে না এমন কিছু নেই। মৃত্যুর সঙ্গে কতদিন লড়াই করে করে হাঁপিয়ে উঠেছিলো সে।

বনহুর শিস দিলো।

সঙ্গে সঙ্গে তাজ এসে দাঁড়ালো সেখানে।

বনহুর মিস মতিবাঈকে অশ্বপৃষ্ঠে তুলে দিয়ে নিজেও চেপে বসলো।

তাজ এবার উল্কাবেগে ছুটতে শুরু করলো।

কিছুটা আসার পর ভীষণ প্রচন্ড একটা শব্দ।

বনহুর তাজসহ দাঁড়িয়ে পড়লো।

ফিরে তাকিয়ে দেখলো সিন্ধি পর্বত আলো আর ধোয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। বিস্ফোরণ চলেছে সেখানে। বনহুর বললো–নরপশুদের আড্ডাখানা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলো তার সঙ্গে ধ্বংস হয়েছে শয়তান নরপশুদল।

বললো মিস মতিবাঈ–যে আমার পিতাকে হত্যা করে আমাকে তুলে এনেছিলো সেই ভয়ংকার দস্যু বনহুরেরও কি মৃত্যু ঘটেছে?

বনহুর হেসে বললো–এ মুহূর্তে যার অশ্বে আছো সেই তো দস্যু বনহুর।

আপনি। আপনি দস্যু বনহুর?

হা মিস মতিবাঈ।

কি বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ জানাবো ভেবে পাচ্ছি না। আমি না জেনে অমন কথা মুখে এনেছিলাম। ওরা তবে কারা?

ওরা নরপশু যারা অন্যের নাম করে কুকর্ম করে যায়। ওদের পরিচয় নেই। ওরা সমাজের আবর্জনা।

আবার অশ্ব ছুটতে শুরু করে।

বনহুর মিস মতিবাঈকে ধরে রাখে যেন ছিটকে না পড়ে।

ঝামপর্বত ছেড়ে ঘন জঙ্গল তারপর প্রান্তর পেরিয়ে আবার বনভূমি। এসব অতিক্রম করে এক নির্জন স্থানে এসে বনহুর অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নেমে পড়লো।

রাত তখন ভোর হয়ে গেছে।

তাজ অত্যন্ত দ্রুতগামী অশ্ব, তাই তারা এত অল্পসময়ে এত দূর চলে আসতে সক্ষম হয়েছে।

অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নেমে বনহুর নামিয়ে নিলো মিস মতিবাঈকে। এমন এক জায়গা যেখানে চারপাশে উঁচু টিলা, মাঝখানে কিছুটা সমভূমি।

একপাশে কিছুটা ফাঁকা জায়গা।

যে পথে বনহুর অশ্ব নিয়ে প্রবেশ করলো সেই স্থানটি টিলা বেষ্টিত স্থান।

মিস মতিবাঈ অশ্ব থেকে নেমে প্রথমেই তাকালো বনহুরের জমকালো আবরণে ঢাকা মুখখানার দিকে। আড়ালে কেমন মুখ আছে তা দেখতে ইচ্ছে করছে মিস মতিবাঈয়ের। কিন্তু সাহস হচ্ছে না কথা বলার। একে নির্জন জায়গা তারপর স্বয়ং দস্যু বনহুর।

মিস মতিবাঈ বহুদিন থেকে ঐ নাম শুনে এসেছে, বহু কাহিনী সে শুনেছে লোকমুখে। কখনও তাকে ভয়ংকর বলে মনে হয়েছে। আবার কখনও তাকে দেখতে ইচ্ছে করেছে, কারণ সে শুনেছে বনহুর নাকি বড় সুন্দর সুপুরুষ, তেমনি পরিচ্ছন্ন তার চরিত্র। যখন তার বাপকে হত্যা করে তাকে ধরে আনা হলো তখন তাকে জানানো হলো তার বাবাকে দস্যু বনহুর হত্যা করে তাকে তুলে এনেছে। বহু অর্থের বিনিময়ে তাকে মুক্তি দেওয়া হবে।

মিস মতিবাঈয়ের মনে তখন ভীষণ ঘৃণা জন্মেছিলো। যে দস্যু বনহুর সম্বন্ধে তার এত সুন্দর পবিত্র মনোভাব ছিলো তা ধূলিসাৎ হয়ে গেলো নিমিষে।

যে দস্যু বনহুরকে সে ঘৃণা করেছিলো সেই দস্যু বনহুরই তাকে দোজখের যন্ত্রণা থেকে উদ্ধার করলো। কত মহান সে...

বনহুর বুঝতে পারলো মিস মতিবাঈ তাকে নিয়েই ভাবছে, তাকে সে ভুল বুঝেছিলো, এখন তার সমাধান সে খুঁজে পেয়েছে। তার মুখ সে দেখতে চায়, নইলে সে বারবার তাকাতো না তার মুখের দিকে।

বনহুর হেসে নিজের মুখের অর্ধাংশ যা কালো পাগড়িতে ঢাকা ছিলো তা খুলে ফেলে, তারপর বলে মিস মতিবাঈ আপনি এখানে বসে বিশ্রাম করুন আমি দেখি কিছু ফলমূল পাই কিনা।

তাজ পটন মনে ঘাস খেতে শুরু করেছে।

বনহুর একবার মিস মতিবাঈয়ের দিকে তাকিয়ে দেখে চলে গেলো কিছু ফলমূলের সন্ধানে।

এখন মিস মতিবাঈয়ের যেন নতুন জীবন ফিরে এসেছে। সে যা ভেবেছিলো তাই সত্য। দস্যু বনহুর সম্বন্ধে তার একটা ঘৃণাযুক্ত মনোভাব ছিলো তা নিমিষে

উবে যায়।

সত্যি বনহুর এত সুন্দর, এত মহৎ যার কোনো তুলনা হয় না। বয়স হলেও বনহুরের সৌন্দর্য কমেনি এতটুকু, বরং তার মধ্যে আরও পৌরষভাব পরিস্ফুটিত হয়েছে।

সৌন্দর্যের প্রতীক যেন দস্যু বনহুর।

মিস মতিবাঈ অনেক কথা ভাবছে। তার বাবার মৃত্যুর কথধা ভাবতেই দুচোখ ভরে পানি আসে। ইচ্ছে হয় ডুকরে কাঁদে–কিন্তু কাঁদতে সে পারে না। মনে পড়ে বৃদ্ধা মায়ের কথা, কতদিন মাকে সে দেখেনি। এবার সে মাকে দেখতে পাবে। দস্যু বনহুর তাকে তার মায়ের কাছে পৌঁছে দেবে।

বহু মূল্যবান অলংকার সেদিন মিস মতিবাঈয়ের দেহে ছিলো। সব ওরা ছিনিয়ে নিয়েছে। তাতে দুঃখ নেই ওর। তার স্নেহময় পিতাকে হারিয়েছে। হারাতে বসেছিলো নিজের জীবন তা ফিরে পেলো আজ বনহুরের জন্য।

মনে মনে বনহুরকে অশেষ ধন্যবাদ জানায় মিস মতিবাঈ।

বেশ সময় অতিবাহিত হলো।

ফিরে এলো বনহুর, তার হাতে কয়েকটা ফল রয়েছে।

মিস মতিবাঈ এত বেশি ক্ষুধার্ত ছিলো যে সে দাঁড়াতে পারছিলো না। একবার ফিরে তাকিয়ে বনহুরকে দেখে নিয়ে মাথা নত করলো।

বনহুর মিস মতিবাঈয়ের পাশে এসে বসলো, তারপর বললো–মিস মতিবাঈ, খান।

মিস মতিবাঈ বললো–আমাকে তুমি বলবেন কারণ একটু আগেও আপনি আমাকে তুমি বলেছেন।

তাতে কি আসে যায়। বেশ, তুমিই বলবো। এগুলো খাও। ফলগুলো মিস মতিবাঈয়ের হাতে দেয় বনহুর।

মিস মতিবাঈ বলে–আপনি খাবেন না? নিন, আপনিও খান।

না, আমি আর খাবো না। প্রচুর ফল ছিলো, আমি পেটভরে খেয়েছি। বনহুর কথাটা বলে উঠে গেলে তাজের পাশে।

জমকালো অশ্ব তাজ।

আজও সে পূর্বের মত শক্তিশালী বলিষ্ঠ আছে। তার দেহের কোথাও একটুও ম্লান হয়নি। বনহুর তাজের পাশে এসে পিঠ চাপড়ে দিলো।

*

গভীর রাত।

মিস মতিবাঈ ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে বসেছিলো।

গা তার ছম ছম করছে।

হাজার সাধু হোক তবু তো দস্যু বনহুর পুরুষ মানুষ। একা সে কেউ নেই তার নিকটে স্বয়ং দস্যু বনহুর ছাড়া।

মতিবাঈ ভীতভাবে একটা টিলায় হেলান দিয়ে বসে বসে ঝিমুচ্ছিলো।

বনহুর বলেছে রাত গভীর না হলে তাকে নিয়ে রওয়ানা দেওয়া সমীচীন হবে না, কারণ তাজকে নিয়েই তার শহরে পৌঁছতে হবে।

এখন বনহুর বেশ দূরে, সেও একটা পাথরে হেলান দিয়ে ঘুমাচ্ছিলো।

মতিবাঈ কিন্তু একটুও ঘুমাতে পারেনি। নানা ধরনের ভীতিভাব তাকে অস্থির করে তুলেছিলো।

বনহুর এবার সজাগ হয়ে উঠলো, বললো–মিস মতিবাঈ, এবার রওয়ানা দিতে হবে।

মতিবাঈ উঠে দাঁড়ালো, মনটা তার অস্থির হয়ে উঠছে। কতক্ষণে সে যাবে, তার মায়ের কাছে। বনহুর বলবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রস্তুত হয়ে নিলো।

বনহুর হাই তুলে বললো–রাতের অন্ধকারে তোমাকে পৌঁছে দিতে চাই তোমাদের বাড়িতে।

হাঁ, তাই করুন।

বনহুর বসিয়ে দিলো মিস মতিবাঈকে, তারপর সে নিজেও উঠে বসলো।

তাজ এবার ছুটতে শুরু করলো।

বনবাদাড় পেরিয়ে উল্কা বেগে ছুটছে তাজ।

অন্ধকারেই তাজ পথ চিনতো।

বনহুরের দৃষ্টিও ছিলো অত্যন্ত প্রখর সেও রাতের অন্ধকারে সবচেয়ে বেশি চিনতো গহন জঙ্গলের পথ।

আকাশে তারা জ্বলছে।

মাঝে মাঝে দমকা হাওয়া সমস্ত শরীরে শিহরণ জাগায়।

দূরে শোনা যাচ্ছে বন্য জীবজন্তুর হুঙ্কার।

মিস মতিবাঈ আর দস্যু বনহুর কান্দাই শহরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

নিস্তব্ধ পাথুরিয়া পথে তাজের খুরের শব্দ প্রতিধ্বনি তুলছে।

বনহুরের দেহে জমকালো পোশাক।

পাগড়ির আঁচল দিয়ে মুখের অর্ধেক ঢাকা।

পায়ে ভারী বুট।

কোমরের বেল্টে রিভলভার।

*

শহরে প্রবেশ করে অশ্বত্যাগ করলো বনহুর, নামিয়ে নিলো সে মিস মতিবাঈকে।

জমাট অন্ধকার।

চারদিকে থমথমে ভাব।

কাছের মানুষটাকেও দেখা যায় না।

বনহুর অন্ধকারে তাজের পিঠ চাপড়ে তাকে আদর জানালো।

তাজকে দেখা যাচ্ছে না।

শুধু জমকালো ছায়ার মত মনে হচ্ছে তাজের ছায়াটা, সামান্য নজরে পড়ছে।

বনহুর বললো–কিছুটা পথ হাঁটতে হবে।

পারবো! বললো মিস্ মতিবাঈ।

বনহুর ওর হাত ধরে এগিয়ে চললো।

নিকটে একটা হোটেলের সামনে এসে দাঁড়ালো।

একটা মোটরগাড়ি অপেক্ষা করছিলো।

বনহুর পকেট থেকে এক গোছ চাবি বের করে নিয়ে গাড়ির দরজা খুলে ফেললো।

মিস মতিবাঈকে বললো–উঠে বসে পড়ো মতি।

বনহুর মতিবাঈয়ের সঙ্গে এখন স্বাভাবিকভাবে কথাবার্তা বলতে শুরু করলো।

মতিবাঈও অনেকটা স্বাভাবিক হয়েছে।

বনহুর ড্রাইভ আসনে বসে গাড়িতে স্টার্ট দিলো।

মিস মতিবাঈ বসেছিলো পেছন আসনে।

হোটেলের কেউ জানলো না তাদের একখানা গাড়ি তাদের অলক্ষ্যে উধাও হলো।

স্পীডে গাড়ি ছুটে চলেছে।

রাজপথ জনশূন্য বলা যায়।

দুএকটা যানবাহন পথের নীরবতা ভঙ্গ করে এদিক থেকে ওদিক চলে যাচ্ছে।

এক সময় গাড়ি এসে থামলো ভৌমবাড়ির অদূরে একটা বিরাট মেহগনি গাছের আড়ালে।

বনহুর গাড়ি থেকে নেমে গাড়ির পেছন দরজা খুলে ধরলো।

অন্ধকার হলেও লাইটপোষ্টের আলোতে ভৌমবাড়িখানা স্পষ্ট নজরে পড়ছে। মিস। মতিবাঈয়ের চিনতে বাকি রইলো না, নিজ বাড়ির সন্নিকটে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে।

তার আনন্দের সীমা নেই।

খুশিতে উচ্ছল হয়ে উঠেছে মিস মতিবাঈ।

অন্ধকারেও আনন্দে চোখ দুটো ওর জ্বলছে যেন।

বললো বনহুর–নেমে এসো মতিবাঈ।

মিস মতিবাঈ গাড়ি থেকে নেমে পড়লো।

অন্ধকারেই তাকালো সে বনহুরের মুখের দিকে। সে ঐ মুখখানাকে স্পষ্টভাবে দেখতে চায়। কৃতজ্ঞতায় তার মন ভরে উঠেছে। সেই ভয়ংকর গুহা থেকে তাকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। গভীর ভাবের আবেগে মিস মতিবাঈ ভাষা হারিয়ে ফেলে।

ভাবছে মতিবাঈ ঐ বাড়িখানার মধ্যে একটা কক্ষে তার মা হয় ঘুমিয়ে আছেন নয় পায়চারী করছেন। ব্যথা বেদনা নিয়ে কেউ ঘুমাতে পারে? নয়তো বা মৃত্যুবরণ

করেছেন তিনি। পিতার মৃত্যু মায়ের মৃত্যু কি করে মতিবাঈ সহ্য করবে। চোখ দুটো তার কানায় কানায় ভরে উঠে।

বনহুর বলে– কি ভাবছো মতিবাঈ? যাও তুমি।

আপনি! আপনি যাবেন না আমার সঙ্গে?

না।

কেন?

একটু হেসে বললো বনহুর–তুমি তো জানো সব, ওখানে যাওয়া আমার সমীচীন হবে না। তুমি যাও।

আমার মার সঙ্গে দেখা করে যাবেন।

না, তা সম্ভব নয়।

আমি আপনাকে যেতে দেবো না। আমার মায়ের সঙ্গে আপনার পরিচয়...

মতিবাঈ, যা সম্ভব নয় তা হয় না। আমি বিদায় নিচ্ছি।

তাহলে একটু অপেক্ষা করেন আমার মাকে এখানে ডেকে আনি। অবশ্য আমার মা যদি জীবিত থাকেন, তিনি যদি সুস্থ থাকেন... কণ্ঠ ধরে আসে মিস মতিবাঈয়ের।

বনহুর পারলো না মিস মতিবাঈয়ের কথা উপেক্ষা করতে। সে বললো–বেশ, আমি অপেক্ষা করছি।

চলে গেলো মতিবাঈ।

গেট পেরিয়ে অন্তপুরে।

বনহুর মেহগনি গাছটার নিচে পায়চারী করতে লাগলো।

মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে গেটের দরজার দিকে।

ভাবছে সে, কাউকে না বলে আস্তানা থেকে চলে এসেছে শুধু রহমানকে সঙ্গে নিয়ে। বহমানকে বিদায় দিয়ে সে একা প্রবেশ করেছিলো সিন্ধি পর্বতের মধ্যে। জয়ী সে হয়েছে, যে উদ্দেশ্য নিয়ে সিন্ধি পর্বতে প্রবেশ করেছিলো তা সফল হয়েছে। রহমানের কথা মনে পড়ে। নূর গভীর রাতে সেই ভয়ংকর স্থানে একজন সঙ্গী নিয়ে সন্ধান করে ফিরছিলো দুস্কৃতিকারীদের। সাহস তার ভাল, তবে বিপদের আশঙ্কা ছিলো যথেষ্ট, তাই বনহুর রহমানকে সঙ্গে নিয়েছিলো নূরের। এরপর রহমানের কোনো খোঁজ জানে না বনহুর

বনহুরের চিন্তাজাল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

সে দেখতে পায় মিস মতিবাঈয়ের সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এলো এক বৃদ্ধা। শুভ্র বয়স শুভ্র কেশ, আবছা অন্ধকারেও স্পষ্ট নজরে পড়ছিলো।

বনহুর সিগারেট পান করবে বলে পকেট থেকে সিগারেট কেসটা বের করে নিয়েছিলো হাতে কিন্তু আলো জ্বেলে সিগারেট ধরানো হয়নি।

সিগারেট কেসটা পকেটে রাখলো।

এগিয়ে আসছে বৃদ্ধা মিসেস ভৌম এবং মিস মতিবাঈ।

তাকিয়ে আছে বনহুর।

এগিয়ে এসে থমকে দাঁড়ালো মিস মতিবাঈ। বনহুর একটু আড়ালে ছিলো, সরে এলো।

মিস মতিবাঈ বললো–মা, দেখছো ইনিই আমাকে উদ্ধার করে এনেছেন সেই সিন্ধি পর্বতের ভূগর্ভস্থ গুহা থেকে। ইনিই আমার রক্ষাকারী।

বৃদ্ধা মিসেস ভৌম বললেন–আমি তোমাকে অন্ধকারে ভাল দেখতে পাচ্ছি না। তুমি যেই হও বাবা, আমার একমাত্র কন্যা মতিবাঈকে উদ্ধার করে দিয়ে আমার জীবন রক্ষা করেছে। কথা বলবার সময় বৃদ্ধার গলা কাঁপছিলো। কারণ আনন্দে এমন আত্মহারা হয়ে পড়েছিলো মিসেস ভৌম যে তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসছিলো।

বনহুর বললো–শুধু আপনার আনন্দ আমাকে ধন্য করলো। এবার তাহলে চলি?

আবার কোনোদিন দেখা হবে না? বললেন মিসেস ভৌম।

মিস মতিবাঈ অর্ধেক জমকালো কাপড়ে ঢাকা।

মিসেস ভৌম আশ্চর্য হয়েছিলেন তবু তিনি সংযত রইলেন, এমন এক মুহূর্তে তিনি কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করলেন না।

বনহুর মায়ের কাছে কন্যাকে অর্পণ করে পা বাড়ালো গাড়ির দিকে।

ঐ মুহূর্তে চারপাশের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এলো সশস্ত্র অস্ত্রধারী পুলিশবাহিনী, ঘিরে ফেললো বনহুরকে।

বনহুর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো।

মিসেস ভৌম এবং মিস মতিবাঈ হতভম্ব হয়ে পড়লো। তারা ভাবতেও পারেনি এমন একটা কান্ড ঘটবে।

মিস মতিবাঈ এবং মিসেস ভৌম এ–ওর মুখ চাওয়া–চাওয়ি করে নিলো। উভয়েই যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছে। হঠাৎ একি ঘটনা ঘটলো।

পুলিশবাহিনী কি করে জানলে আজ মিস মতিবাঈকে নিয়ে স্বয়ং দস্যু বনহুর আসবে। কি করে টের পেলোলা তারা ভেবে পায় না মিস মতিবাঈ।

মিসেস ভৌম হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

মিস মতিবাঈ কেঁদে ফেললো প্রায়।

পুলিশবাহিনীর সঙ্গে আছে পুলিশপ্রধান মিঃ হারুন, মিঃ শংকর রাও এবং নূর।

বনহুরের চারপাশ ঘিরে দাঁড়িয়ে পড়েছে সশস্ত্র পুলিশবাহিনী এবং পুলিশ প্রধান ও প্রখ্যাত গোয়েন্দাদ্বয়।

নূরের হাতে রয়েছে রিভলভার।

বনহুরের বুকে চেপে ধরে সে কঠিন কণ্ঠে বলে–একচুল নড়বে না, তাহলে গুলী ছুঁড়বো।

বনহুর চারদিকে তাকিয়ে দেখে নিলো।

অন্ধকার বেশ হাল্কা হয়ে উঠেছে।

ভোর আকাশে সূর্য উদয় হবার পূর্বে একটা শুভ্র আলোকছটা ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীর বুকে।

বনহুরের মুখমন্ডলের অর্ধাংশ ঢাকা, তাই তাকে কেউ ভালোভাবে দেখতে পাচ্ছিলো না।

নূর কঠিন কণ্ঠে পুনরায় গর্জে উঠলো– সাবধান করে দিচ্ছি, কোনোরকম চালাকি করো না। তোমার চারপাশে সশস্ত্র পুলিশ ঘেরাও করে রেখেছে। আমার রিভলভার চেয়ে আছে তোমার বুকে। তা ছাড়া পুলিশপ্রধান মিঃ হারুন আর মিঃ শংকর রাও রয়েছেন–তাদের হাতেও রয়েছে গুলীভরা রিভলভার।

বনহুর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

দৃষ্টি তার সামনে।

মাঝে মাঝে নূরের মুখে দৃষ্টি এসে পড়ছিলো বনহুরের।

মিঃ হারুনের নির্দেশে বনহুরের হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিলো পুলিশবাহিনীর একজন।

চারপাশে উদ্যত রাইফেল।

নূর বিলম্ব না করে এক ঝটকায় খুলে ফেললো বনহুরের মুখ থেকে জমকালো কাপড়ের রুমালখানা। সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য একটা বিস্ময়কর অদ্ভুত শব্দ করে উঠলো সে–আব্বু তুমি! তুমিই দস্যু বনহুর।

বনহুর কোনো জবাব দিলো না।

মিঃ হারুন পুলিশবাহিনীর প্রধানকে বললেন–নিয়ে যাও।

পুলিশবাহিনী প্রধান বনহুরের পিঠে রাইফেল চেপে ধরেছে।

নূরের রিভলভারসহ হাতখানা নেমে এসেছিলো বনহুরের বুক থেকে, তার মুখের কালো কাপড় সরিয়ে নেবার সঙ্গে সঙ্গে, ওর দেহে স্পন্দন আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না।

পুলিশবাহিনী প্রধান বনহুরকে অস্ত্রের মুখে ঘেরাও করে নিয়ে চলে যায়।

মিঃ হারুন তাকায় মিঃ শংকর রাওয়ের মুখের দিকে।

মিঃ শংকর রাও ইংগিত করলেন–চলুন এবার।

মিঃ হারুন নূরকে বললো–চলুন মিঃ নূর।

নূরসহ তারা পা বাড়ালেন তাদের গাড়িগুলোর দিকে।

ততক্ষণে বনহুরের হাতে হাতকড়া এবং কোমরে শিকল বন্ধ করে গাড়িতে তুলে নেওয়া হয়েছে।

পুলিশবাহিনী পরিবেষ্টিত হয়ে বনহুরকে নিয়ে পুলিশভ্যানটা চালাতে শুরু করেছে।

*

ক্ষিপ্তের মত পায়চারী করছে নুর তার নিজের কক্ষে। চোখের সামনে ভাসছে তার অনেক দৃশ্য। মনে পড়ছে অনেক কথা। মা তাকে দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার সম্বন্ধে কোনো কথা বললেই কেমন করে চড় দিতো, একটুও মায়া করতো না তখন। একদিন জমকালো একখানা রুমাল কুড়িয়ে পেয়েছিলো নূর মায়ের ঘরে। মাকে জিজ্ঞাসা করেও তার কোনো জবাব পায়নি সে। হঠাৎ কোনো কোনো দিন গভীর রাতে মায়ের ঘরে কারও গলার আওয়াজ সে শুনতে পেয়েছে, জিজ্ঞাসা করলে মা নীরব থেকেছে।

আজ নূরের, কাছে সমস্ত পৃথিবীটা যেন গোলক ধাঁধা মনে হচ্ছে। সব যেন কেমন এলোমেলো মনে হচ্ছে, জমাট অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে আসছে চারদিক।

নুর অস্থিরচিত্ত নিয়ে কয়েক ঘন্টা কাটিয়ে দিয়েছে। নূর জানতে তার আব্বুর মত দেবচরিত্র মহৎ ব্যক্তি আর হয় না। তার আব্বু অন্যান্যের চেয়ে সম্পূর্ণ

আলাদা মানুষ, তার হাসি তার কণ্ঠস্বরে এ যেন আর কারও মুখে কোনোদিন দেখেনি, কারও কণ্ঠে কোনোদিন শোনেনি। সেই তার আব্বু দস্যুযে দস্যুর নাম স্মরণ করলে মানুষের হৃদকম্প শুরু হয়, যে দস্যুর ভয়ে সমস্ত পৃথিবীর মানুষ আতঙ্কগ্রস্ত সেই দস্যু তার আব্বুর নিজের দুই হাতে মাথার চুল টেনে ছিঁড়তে থাকেনা না, এ মুখ আর সে কাউকে দেখাবে না, কারও সম্মুখে সে যেতে পারবে না তার আব্বু দস্যু বনহুর সবাই তার দিকে তাকিয়ে ইংগিতপূর্ণ হাসি হাসবে কি করে সে নিজেকে সংযত রাখবে তখন, কি করে সে এসব ইংগিতপূর্ণ সমালোচনা সহ্য করবে দস্যু বনহুরের গ্রেপ্তারই তার আসল উদ্দেশ্য ছিলো এবং সে কারণেই নূর বিদেশ গিয়েছিলো দক্ষ ডিটেকটিভ হবার জন্য উদ্দেশ্য আজ সফল হলো কিন্তু কিন্তু… না না, এ কি করে সম্ভব হয় তার আব্বু দস্যু বনহুর…এ কথা সে কি করে মেনে নিতে পারবে তার আব্বুকে সে আজ নিজে কৌশলে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছে। জয়ী হয়েছে সে কিন্তু এ জয় কি তার জীবনকে সার্থক করতে পারলো? না না, সে সফলকাম হলেও জয়ী সে হয়নি, জয়ী সে হয়নি কেন, কেন তার আব্বু তার কাছে আত্মগোপন করেছিলেন, কেন তার আসল পরিচয় তাকে দেননি তিনি। আম্মি তো বলতে পারতো, তাহলে হয়তো এর একটা সমাধান সে খুঁজে পেতো, কিন্তু….

নূর বিলম্ব না করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসে নিচে। উদভ্রান্তের মত ছুটলো সে গাড়ি নিয়ে চৌধুরীবাড়ি অভিমুখে। নিজেই সে ড্রাইভ করে চলেছে।

গাড়িতে যখন নূর উঠে বসলো তখন ড্রাইভার ছুটে এসেছিলো গাড়ির পাশে।

কিন্তু নূর তার সঙ্গে একটা কথাও না বলে গাড়ির দরজা খুলে গাড়ির ড্রাইভিং আসনে উঠে ষ্টার্ট দিয়েছিলো।

গাড়ি কান্দাই রাজপথ বেয়ে উল্কাবেগে ছুটে চলেছে।

পাশ কেটে চলে যাচ্ছে অন্যান্য যানবাহন।

কখন যে ধাক্কা লেগে এক্সিডেন্ট করে বসবে কে জানে।

কোনোদিকে খেয়াল নেই তার।

এক্সিডেন্ট হওয়া অস্বাভাবিক নয় মোটেই।

এলোপাতাড়ি চিন্তাধারা নিয়েও নূর সঠিকভাবে গাড়ি চালিয়ে একসময় পৌঁছে গেলো চৌধুরীবাড়িতে।

গাড়িখানা রেখে একরকম প্রায় ছুটেই চললো নূর সিঁড়ি বেয়ে উপরে।

বৃদ্ধ সরকার সাহেব নিচে ছিলেন, নূর তার সঙ্গে একটা কথাও বললো না।

গেটে দারোয়ান। সেও অবাক, ছোট সাহেব এমনভাবে গাড়ি নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলো। যা তাকে বিস্মিত করে তোলে।

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে সে।

নূর যখন সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে যাচ্ছিলো তখন বাড়ির চাকর বাকর সকলে অবাক, এমনভাবে তো নূরকে তারা কোনোদিন দেখেনি।

এ ওর মুখ চাওয়া–চাওয়ি করছে।

নূর উপরে উঠে সোজা মায়ের কক্ষে প্রবেশ করে ডাকলো–আম্মি!

মনিরা তখন কি যেন করছিলো, পুত্রের কণ্ঠস্বরে ফিরে না তাকিয়ে দীপ্তকণ্ঠে বললো–নূর তুই এসেছিস বাবা...ফিরে দাঁড়াতেই নূরের উদ্ভ্রান্ত চেহারা দেখে অবাক হলো। ওর পা থেকে মাথা পর্যন্ত তাকিয়ে দেখে কিছু বলতে যাচ্ছিলো।

নূর কঠিন কণ্ঠে বললো–আম্মি জবাব দাও কেন তোমরা এতদিন আমার সঙ্গে চাতুরি করেছে।

চাতুরি! অবাক কণ্ঠে বললো মনিরা।

নূর গম্ভীর গলায় বললো–কেন তোমরা আমার সঙ্গে এ সব করেছো? আমার আব্বুর পরিচয় গোপন রেখে আমাকে দিয়ে তোমরা তামাসার খেল খেলেছো?

নূর!

আম্মি আমি যা বললাম তার জবাব দাও? কেন আজ তোমরা আমাকে নিঃশেষ করে দিলে? আমার পরিচয় যদি এত জঘন্য তবে কেন আমাকে তোমরা

হত্যা না করে জীবিত রেখেছিলে। ছিঃ ছিঃ ছিঃ আমি কোন মুখে লোকসমাজে গিয়ে দাঁড়াবো

নূর কি বলছিস আমি কিছু বুঝতে পারি না।

তা পারবে কেন? তোমরা এমন জঘন্য যার কোনো তুলনা হয় না।

নূর!

আম্মি, আমি তোমাদের সন্তান একথা ভাবতেও ঘৃণা বোধ করছি। আমার পরিচয় আমি এক দস্যুসন্তান বাষ্পরুদ্ধ–কণ্ঠে কথাগুলো বলে ধপ্ করে নূর বসে পড়লো একটা চেয়ারে।

মনিরার চোখের সামনে সমস্ত ঘরখানা যেন দুলছে। সে সরে এলো সন্তানের পাশে, ওর কাঁধে হাত রেখে কিছু বলতে গেলে কিন্তু বলতে পারলো না।

নূর এক ঝটকায় মনিরার হাতখানা কাঁধ থেকে সরিয়ে দিয়ে বললো–আবুই যে দস্যু বনহুর একথা কেন আমাকে তোমরা বলোনি? কেন গোপন রেখেছিলে? যার জন্য আমি আজ মানুষের কাছে এক হাস্যকর বস্তু হয়ে উঠলাম। আম্মি, তুমি মা হয়ে কি করে পারলে আমায় দিয়ে সাপের খেলা খেলাতে?

নূর, বাবা আমাকে তুই মাফ করে দে।

মাফ করবো?

হাঁ, হাঁ, বাবা, তোর আব্বুর কথাতেই আমি তার পরিচয় তোর কাছে গোপন রেখেছিলাম।

ভুল করেছিলে আম্মি, ভুল করেছিলে। সেদিন যদি আমি জানতে পারতাম তাহলে এমনভাবে আজ আমাকে সবার চোখে হেয় হতে হতো না। আমি নিজেই বেছে নিতাম আমার কি করণীয়। আমি বিদেশ থেকে আর ফিরে আসতাম না। আম্মি, কেন বলোনি সেদিন যখন আমি প্রশ্ন করতাম আমার আব্বু কোথায়? কেন তিনি আসলেন না? কোথায় থাকেন আমার আব্বু? কেন সেদিন রাশি রাশি মিথ্যা কথা বলে আমার কচি মনকে ভুলপথে চালিত করেছিলে? বলল, বলল আম্মি, আমি জানতে চাই কেন সেদিন সত্যকথা বলো নি?

নূর, আমি বলতে চাইলেও বলতে পারিনি।

তাই বলে মিথ্যা বলেছিলে এতদিন সন্তানের কাছে?

এ ছাড়া কোনো উপায় ছিলো না।

আম্মি।

নূর, আমার বুকটা চিরে যদি দেখাতে পারতাম কত ব্যথা জমাট বেঁধে আছে এ বুকে।

আম্মি আমি জানি, আজ আমি সব বুঝতে পারছি কেন তুমি আমার কাছে আত্মগোপন করে থাকতে চেষ্টা করেছে। সব আমি আজ উপলব্ধি করতে সক্ষম হলাম। আমি ভাবতেও পারিনি আমার আব্বুই স্বয়ং দস্যু বনহুর...একটু থেমে বললো নূর, আম্মি, আজ আমি তাকে গ্রেপ্তার করেছি...

নুর!

হাঁ।

তোর আব্বুকে তুই গ্রেপ্তার করেছিস?

আব্বুকে নয়–দস্যু বনহুরকে।

নূর!

আমি আর কোনো কথা শুনতে চাই না। আমি একজন ডিটেকটিভ, আমার কর্তব্য আমি পালন করেছি এবং করে যাবো। কথাটা বলে নূর যেভাবে কক্ষে প্রবেশ করেছিলো সেইভাবে বেরিয়ে যায়।

মনিরা ডাকে–নূর শোন্। শোন্ বাবা শুনে যা।

ততক্ষণে বেরিয়ে গেছে নূর।

মরিয়ম বেগম এসে দরজায় দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি কিছু বুঝতে না পেরে হতভম্ব হয়ে যান। তিনি তাকান একবার নূরের চলে যাওয়া পথের দিকে আর একবার

তাকান মনিরার মুখের দিকে।

কিছুই তিনি বুঝতে পারছেন না।

নূর তো এসে কোনোদিন অমন করে চলে যায় না। আজ সে অমন করে চলে গেলো কেন? কি হয়েছে তার? বললেন এবার মরিয়ম বেগম– বৌমা, নূর অমন করে চলে গেলো কেন?

মনিরা বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললো–ও জানতে পেরেছে ওর পিতার পরিচয়।

তা ও কি করে জানো…মরিয়ম বেগম একটু বিব্রতকণ্ঠে কথাগুলো উচ্চারণ করলেন।

মনিরা শক্ত গলায় বললো– কতদিন এ কথা লুকিয়ে থাকে বলে? একদিন নূর জানতে পারবে এটা আমি জানতাম এবং সে জন্য প্রস্তুত ছিলাম। শোনো মামীমা, তোমার ছেলেকে নূর গ্রেপ্তার করেছে।

কি বললে বৌমা। মনির আমার গ্রেপ্তার হয়েছে।

হাঁ, নূর, তার পুত্র তাকে গ্রেপ্তার করেছে।

বল কি বৌমা?

যা সত্য তাই বললাম।

কিন্তু….

মামীমা, কোনো কিন্তু নেই এর মধ্যে।

তাহলে নূর ওর আব্বুকে গ্রেপ্তার করেছে। বাষ্পরুদ্ধ হয়ে এসেছে মরিয়ম বেগমের গলাটা।

সরকার সাহেব এসে পেছনে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি শাশুড়ি এবং পুত্রবধূর সব কথা কান পেতে শুনলেন। এমন হবে তিনি জানতেন। নূরকে হন্তদন্তভাবে প্রবেশ করতে দেখেই সরকার সাহেব অনুমান করে নিতে পেরেছিলেন যে কিছু একটা ঘটেছে।

যা তিনি সন্দেহ করেছিলেন তাই ঘটে গেলো।

*

কান্দাইয়ের পত্রিকাগুলোতে বড় বড় অক্ষরে ছাপা হলো, দস্যু বনহুর গ্রেপ্তার হয়েছে তাকে গ্রেপ্তার করেছেন তরুণ ডিটেকটিভ মিঃ নুরুজ্জামান চৌধুরী। তাঁকে সাহায্য করেছেন পুলিশপ্রধান মিঃ হারুন এবং বিশিষ্ট গোয়েন্দা প্রধান মিঃ শংকর রাও। শহরে ছড়িয়ে পড়লো খবরটা।

দস্যু বনহুর গ্রেপ্তার হয়েছে যারা স্মাগলার, যারা অসৎ উপায়ে টাকা উপার্জন করে ধনকুবের হয়েছে তারা আনন্দে আত্মহারা হলো। আর যারা দুঃস্থ অসহায় মানুষ, যারা সৎভাবে উপার্জন করে সুনাম অর্জন করেছেন এবং ধনবান হয়েছেন তারা ব্যথিত হলেন, কারণ দস্যু বনহুর তাঁদের কোনোদিন ক্ষতি সাধন করেনি। বরং দুঃস্থ মানুষ বনহুরের দয়ায় উপকৃত হয়েছে সর্বক্ষণ।

এই সংবাদ সবার কানে যখন পৌঁছে গেলো তখন বনহুর হাঙ্গেরী কারাগারের লৌহ প্রাচীরে একটা সেলে আবদ্ধ রয়েছে।

এবার বনহুরকে হাঙ্গেরী কারাগারেও শৃংখলবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। হাতের বাঁধন মুক্ত করে দেওয়া হয়নি বা শিকল মুক্ত করে দেওয়া হয়নি তার শরীর থেকে।

বনহুরের গ্রেপ্তার সংবাদ পৌঁছে গেলো কান্দাই বনহুরের আস্তানায়।

সমস্ত আস্তানায় আলোড়ন সৃষ্টি হলো।

জাভেদ আশাকে নিয়ে তার চোখের চিকিৎসার জন্য গিয়েছিলো কান্দাইয়ের বাইরে। কিন্তু সংবাদপত্রে বনহুরের গ্রেপ্তার সংবাদ পেয়ে তারা ভীষণ উল্কণ্ঠিত হয়ে ফিরে আসে কান্দাই আস্তানায়। জাভেদ এসে নূরীকে বললো—-জানতে পারলাম বাপুকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে?

নূরী আকাশ থেকে পড়লো না, সে যেমন ছিলো তেমনি স্বাভাবিক কণ্ঠে বললো–আমি জানতাম এমনি কিছু একটা ঘটেছে, কারণ গভীর রাতে সে কাউকে কিছু না বলে চলে গেলো আর ফিরে এলো না তখনই আমার সন্দেহ হয়েছিলো।

জাভেদ গম্ভীর হয়ে পড়েছিলো, তার চোখে মুখে ফুটে উঠেছিলো একটা ক্রুদ্ধ হিংস্র ভাব। তার বাপু গ্রেপ্তার হয়েছে, এ যেন তার সহ্য হচ্ছিলো না।

বললো জাবেদ–জানো আম্মি, বাপুকে গ্রেপ্তার করেছে কে?

নিশ্চয়ই কোনো মহাপুরুষ। বল নূরী?

জাভেদ বললো–মহাপুরুষ হলো তরুণ গোয়েন্দা ডিটেকটিভ নুরুজ্জামান চৌধুরী।

কি বললি জাভেদ

তরুণ ডিটেকটিভ নুরুজ্জামান চৌধুরী।

নুর–নুরুজ্জামান চৌধুরী গ্রেপ্তার করেছে হুরকে?

হাঁ, তবে একা সে ছিলো না, তাকে সাহায্য করেছে পুলিশমহল। একটু থেমে বললো–আমি এই তরুণ ডিটেকটিভকে দেখে নেবো তার কত সাধ্য বাপুকে আটকে রাখে।

জাভেদ। কোনো বিপদ যদি আসে তখন কি হবে? বললো নুরী।

আশা বলে উঠলো–বিপদকে জয় করাই তো পুরুষের কাজ। নূরী, বোন ওকে বাধা দিও না। পুলিশমহলকে পরাজিত করে জাভেদ তার বাপুকে মুক্ত করে আনবে।

এমন সময় রহমান আসে সেখানে, সে সব না জানলেও কিছুটা জানে। মিস মতিবাঈকে উদ্ধার করে পৌঁছে দিতে গিয়েই এই ঘটনা ঘটেছে, এ কথা সে জানে। জানলেও সব কথা বলা সম্ভব নয় তাই রহমান চুপ রইলো।

জাভেদ ক্রুদ্ধ সিংহের মত গর্জন করে উঠলো–রহমান চাচা, বাবাকে ওরা আটক করে রাখবে এ আমি সহ্য করবো না।

রহমান বললো–হুঁকুম করো ছোট সর্দার, কি করতে হবে।

তাজ কোথায়?

সে ফিরে এসেছে।

তাজকে প্রস্তুত করো, আমি একাই আগে যাবো দেখবো তারপর যা হয় করা যাবে।

বেশ, তাই হবে। বললো রহমান।

জাভেদ বেরিয়ে গেলো।

নূরী বললো–রহমান ভাই, এ কি হলো।

সর্দারকে এবার পুলিশবাহিনী হাঙ্গেরী কারাগারের সেলে শৃংখলাবদ্ধ করে রেখেছে। তার। চারপাশে খুব কড়া পাহারা রাখা হয়েছে।

তাহলে উপায়?

আশা বললো–জাভেদ উপায় খুঁজে বের করবে।

কিন্তু

নূরী, তুমি না দস্যু বনহুরের সহধর্মিনী! তোমার দুর্বলতা শোভা পায় না।

ঠিক বলেছো বোন, আমি দস্যু সহধর্মিনী এবং দস্যুজননী! আমাকে কঠিন হতে হবে। বললো নূরী।

রহমান বললো–নূরী, হয়তো তোমাকেও সর্দারের মুক্তির জন্য সংগ্রাম করতে হবে।

আমি প্রস্তুত রহমান ভাই। বললে নূরী।

আশা বললো– সাবাস! একটু থেমে বললো–যদি আমার দৃষ্টিশক্তি না হারাতাম তাহলে এ মুহূর্তে আমি নিজেও নিশ্চুপ থাকতাম না।

জানি বোন, জানি। তুমি আশীর্বাদ করো আমার জাভেদ যেন তার পিতাকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়।

হবে বোন নূরী, হবে। আমি জানি জাভেদ তার পিতার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়।

*

পুলিশমহলে ভীষণ সাড়া পড়ে গেছে।

দস্যু বনহুর গ্রেপ্তার হয়েছে এটা কান্দাই পুলিশমহলের বিরাট একটা সাফল্য। তারা জয়ী হয়েছে–শুধু জয়ী নয়, বিরাট জয়।

মিঃ হারুন এবং শংকর রাও শুধু জানেন দস্যু বনহুরের সন্তান হলো নূর এবং সেই নূর আজ স্বয়ং দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছে।

বনহুর হাঙ্গেরী কারাগারে বন্দী আছে।

এবার শুধু প্রহরী বেষ্টিত নয়, কামান–গোলা–বারুদ নিয়ে ঘেরাও করে রাখা হয়েছে হাঙ্গেরী কারাগার। পুলিশমহল অত্যন্ত সজাগ, যেন কোনোক্রমে এবার সে পালাতে সক্ষম না হয়।

পুলিশমহলে যখন দস্যু বনহুরের গ্রেপ্তার নিয়ে নানা ধরনের আনন্দজনক আলাপ আলোচনা চলছে, আনন্দ উৎসব চলছে তখন নূরকেও আহ্বান জানানো হলো। কিন্তু নূর এসব আনন্দজনক আহ্বানে সাড়া দিতে পারলো না, এমন কি বনহুরকে গ্রেপ্তারের জন্য ঘোষণাকৃত অর্থও সে গ্রহণ করতে রাজি হলো না।

নূর বনহুরকে গ্রেপ্তারের পর একেবারে নিশ্চুপ বনে গেলো। সে নিজের বাড়ি থেকে একটিবারও বের হলো না। চৌধুরীবাড়ি থেকে ফেরার পর সে যেন একেবারে গুম হয়ে গেছে।

পুলিশপ্রধান মিঃ হারুন এবং মিঃ শংকর রাও নিজেরা জানেন এবং এ ব্যাপার নিয়ে অত্যন্ত গোপনীয়ভাবে আলাপ করছেন কেন নূর বনহুরকে গ্রেপ্তারের পর থেকে থ হয়ে গেছে। কেন সে তাদের আহ্বানে সাড়া দিচ্ছে না।

এই দুই পুলিশপ্রধান ছাড়া তেমন কেউ জানে না এই গভীর রহস্যের কথা।

পুলিশপ্রধান মিঃ হামবার্ড, তিনি নূরকে ধন্যবাদ জানাতে একদিন তার বাড়িতে গিয়ে হাজির হলেন। গাড়ি রেখে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলেন তিনি।

নূর চেয়ারে বসে আপন মনে কিছু ভাবছিলো।

মিঃ হামবার্ডকে দেখে আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালো নূর। এলোমেলো চুল, শরীরে চাদর জড়ানো, কেমন যেন উদ্ভ্রান্ত চেহারা।

মিঃ হামবার্ড হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন–অভিনন্দন গ্রহণ করুন মিঃ নূর।

নূর হাত বাড়িয়ে হ্যান্ডশেক করে বললো–ধন্যবাদ। বসুন মিঃ হামবার্ড।

আসন গ্রহণ করলেন মিঃ হামবার্ড।

নূরও চেয়ারে বসে পড়লো।

মিঃ হামবার্ড হেসে উচ্ছল কণ্ঠে বললেন–দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করে আপনি যে সুনাম অর্জন করেছেন তা সত্যি প্রশংসনীয়।

কোনো জবাব দিলো না নূর।

মিঃ হামবার্ড বললেন–আপনি কি অসুস্থ মিঃ নূর?

অন্যমনস্কভাবে জবাব দিলো নূর–না, আমার তেমন কোনো অসুখ-বিসুখ হয়নি।

কিন্তু আপনাকে লক্ষ্য করে আমি বুঝতে পারছি আপনার মন এবং শরীর ভাল নেই।

এ কথা আপনি বললেও আমি বেশ সুস্থ আছি মিঃ হামবার্ড।

আচ্ছা মিঃ নূর, একটা প্রশ্ন করবো যদি কিছু মনে না করেন?

বলুন।

আপনি দেখছি দস্যু বনহুর গ্রেপ্তার হবার পর থেকে কেমন ঝিমিয়ে পড়েছেন। বলুন তো আপনার মধ্যে কেন এমন ভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে?

একটু হেসে বলে নূর–কোনোদিন ভাবতে পারিনি এত সহজে জয়যুক্ত হবে। যদিও আমি বহুদিন হতেই দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তারের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলাম।

এটা তো আপনার আনন্দের কথা মিঃ নূর?

হাঁ।

তবে কেন আপনি..

মিঃ হামবার্ড, সব প্রশ্নের জবাব সব সময় দেওয়া যায় না। যাক বলুন আপনার আগমনের কারণটা কি?

আগমন শুধু আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আপনাকে অভিনন্দন জানানো। যা কারও পক্ষে সম্ভব হয়নি তা আপনার দ্বারা সম্ভব হয়েছে। সমস্ত কান্দাইবাসী আপনার জয় জয়কারে মুখর। আচ্ছা মিঃ নূর, আপনি ঘোষণাকৃত অর্থ কেন গ্রহণ করতে নারাজ বলুন তো?

নূরী নীরব।

মিঃ হামবার্ড সিগারেটের কেস বের করে একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করলেন। তারপর ভ্রূকুঞ্চিত করে বললেন তিনি–আপনি আশ্চর্য মানুষ মিঃ নূর, অর্থের প্রতি আপনার এমন অবহেলা সত্যি আমাদের সবাইকে বিস্মিত করেছে।

এবার নূর কথা বললো–বিস্ময়ের কোনো কারণ নেই মিঃ হামবার্ড। অর্থের মোহ সবার আছে এবং থাকবে তবে প্রয়োজনবোধটাই সর্বোপরি।

তাহলে আপনি বলতে চাইছেন অর্থের প্রয়োজন আপনার নেই? মিঃ হামবার্ড কথাটা বলে তাকালেন নূরের মুখের দিকে।

নূর ভ্রূকুঞ্চিত করে তাকালো মিঃ হামবার্ডের মুখে, সে যেন কথাটা ঠিক বুঝতে পারেনি এমনি ভাব দেখলো।

নূরকে আজও ঠিক বুঝতে পারেননি হামবার্ড। যদিও তিনি কান্দাই শহরে বেশিদিন হলো আসেননি কিন্তু মিঃ নূরের সঙ্গে মিশবার সুযোগ তার হয়েছে বহুবার। নূরকে তিনি যত দেখছেন ততই বিস্মিত হয়েছেন, তার স্বভাব, চালচলন অন্যান্যের চেয়ে যেন পৃথক। নুর কথা কম বলে, কিন্তু কাজ বেশি করে।

শুধু মিঃ হামবার্ডই নন, পুলিশমহল এবং গোয়েন্দা বিভাগের সবাই নূর সম্বন্ধে একটা এমন ধারণা পোষণ করতেন যেন সে এক অস্বাভাবিক পুরুষ, কারণ তার চালচলন স্বাভাবিক ছিলো না, বয়স কম তবু তাকে বেশ মরুব্বি মনে হতো।

মিঃ হামবার্ডের কথায় নূর তাকালো তার মুখে, তারপর শান্ত গলায় বললো– অর্থের প্রয়োজন সবারই আছে কিন্তু প্রয়োজন থাকলেই কিছু গ্রহণ করা যায় না মিঃ হামবার্ড।

নূরের কথায় মিঃ হামবার্ড আশ্চর্য হলেন কিন্তু কোনো জবাব তিনি দিলেন না বা প্রশ্ন করলেন না।

সেদিন আর তেমন কোনো বেশি কথা হলো না মিঃ হামবার্ড এবং নূরের মধ্যে।

নূর নিজে এসে বিদায় জানালো মিঃ হামবার্ডকে।

মিঃ হামবার্ড ঐ মুহূর্তে নূরের নিকট হতে বিদায় গ্রহণ করলেও তার মন স্বচ্ছ হলো না, তিনি এক সময় শংকর রাও এবং মিঃ হারুন ও অন্যান্য পুলিশপ্রধানের সঙ্গে দেখা করলেন এবং নূর সম্বন্ধে জানালেন। নূরের কথাবার্তা শুধু বিস্ময় আনেনি মিঃ হামবার্ডের মনে, একটা বিরাট প্রশ্ন তাকে অস্থির করে তুলেছে–এত অর্থ পেয়েও কেন মিঃ নূর তা গ্রহণ করলেন না।

মিঃ হামবার্ডের মনেই শুধু এই প্রশ্ন বিস্ময় জাগালো না, সবাই আশ্চর্য হলো এবং এ কথাটা নিয়ে শহরে বন্দরে কান্দাইয়ের নানা হোটেল বা সিনেমা হলে আলোচনা চলতে লাগলো। মিঃ নূরুজ্জামান চৌধুরীর এতবড় ত্যাগ সত্যি বিস্ময়কর।

কথাটা একসময় চৌধুরীবাড়িতেও প্রবেশ করলো।

নূর বনহুরকে গ্রেপ্তার করেও ঘোষণাকৃত অর্থ গ্রহণ করেনি, এটা শুনে হাসলো মনিরা।

এক সময় মনিরা হাজির হলো পুত্রের বাংলোয়।

নূর তখন শয্যায় উবু হয়ে পড়েছিলো–নিদ্রিত নয় তবে সম্পূর্ণজাগ্রতও মনে হচ্ছিলো না

মনিরা কক্ষে প্রবেশ করে স্থির হয়ে দাঁড়ালো। কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো পুত্রের দিকে। ডাকলো সে–নূর।

মায়ের কণ্ঠস্বর কানে যেতেই নূর শয্যায় উঠে বসল

মনিরা এসে বসলো পাশে।

নূর বললো–আম্মি, তুমি হঠাৎ যে

মনিরা বললো শুনলাম দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করেও তুমি পুরস্কার গ্রহণ করোনি।

আশ্চর্যভাবে চোখ তুলে মায়ের মুখে তাকালো নূর।

মনিরা বলেই চললো–নূর, তুমি নিজকে বড় ত্যাগী বলে প্রমাণ করতে চাইলেও মানুষ তা বুঝবে না, কাজেই তোমাকে ঐ অর্থ গ্রহণ করতেই হবে।

আম্মি।

হা। করা উচিত বলে মনে করি।

আম্মি, তুমি আগে কেন আমাকে বলোনি যে আমার আব্বুই স্বয়ং....

নূর, তুই বুঝেও কেন বুঝতে চাইছিস না কেন, কেন আমি গোপন করে রেখেছিলাম, এতবড় সত্যি কেন আমি প্রকাশ করিনি।

কেন করোনি বলো আম্মি, বলো?

তোর শিশুমনে আমি গভীর ক্ষত সৃষ্টি করতে চাইনি। আমি জানতাম একদিন সব প্রকাশ পাবেই, তবু বলার সাহস আমার হয়নি।

তুমি ভুল করেছে আম্মি, তুমি ভুল করেছে। যার জন্য আজ আমি কিছুতেই নিজকে সংযত রাখতে পারছি না। নূর উচ্ছ্বসিতভাবে কেঁদে উঠে।

মনিরা স্থবিরের মত নিশ্চুপ ধীরে ধীরে হাতখানা তুলে ধরলো সে পুত্রের মাথায়।

কোনো কথা মনিরা বলতে পারলো না মুহূর্তে।

নূর ছোট্ট বালকের মত কাঁদতে লাগলো। একরাশ জমানো ব্যথা যেন উচ্ছল ঝরণার মত দুচোখ ভরে নেমে এলো। এমন করে সে যেন কতদিন কাঁদতে পারেনি, আজ প্রাণভরে কাদলো নূর।

মনিরার চোখ দুটোও শুষ্ক ছিলো না, গন্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগলো ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু।

এবার নূর অনেকটা শান্ত হলো।

মায়ের কোলে মুখ গুঁজে নিশ্চুপ রইলো কিছুক্ষণ। তারপর বললো নূর–আম্মি, আমার মনে ক্ষত সৃষ্টি না করার জন্য তুমি আমার কাছে আমার পিতার আসল পরিচয় গোপন করে ভাল করোনি।

এ ছাড়া আমার কোনো উপায় ছিলো না নূর। তোর আব্বু একজন দস্যু– এ কথা আমি কোন মুখে তোর কাছে বলবো আর বললেও তুই কথা শেষ না করেই নিশ্চুপ হয়ে যায় মনিরা।

নূর বলে উঠে–যদি বলতে সেদিন, তাহলে আজ আমাকে এমন দুর্বিসহ যন্ত্রণা সহ্য করতে হতো না আম্মি। আমি জানতাম আমার আব্বুই স্বয়ং দস্যু বনহুর।

সেদিন তুই লজ্জায় ঘৃণায় মুষড়ে পড়তিস। হয়তো আমার জীবনে নেমে আসতো জমাট অন্ধকার। আমি হারাতাম তোকে, তাই... তা ছাড়াও তোর আব্বুর নিষেধ ছিলো কোনোক্রমে যেন তোকে না জানাই তার কথা ...

আম্মি, তুমি যা ভেবেছে তা সত্যি নয়, কারণ আমি জানলে হয়তো নিজকে সংযত করে নিতাম। হয়তো আমার জীবন অন্যভাবে গড়ে উঠতো। আমি ডিটেকটিভ না হয়ে হত্যম শিল্পী, না হয় হতাম বৈজ্ঞানিক বা অন্য কিছু...

নুর!

হাঁ আম্মি, আমি দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তারের জন্যই ডিটেকটিভ হয়েছি। তবে কি জানো আম্মি দস্যু বনহুরকে আমি গ্রেপ্তার করবে শপথ গ্রহণ করলেও আমার মন দস্যু বনহুরের নাম স্মরণ করে শ্রদ্ধায় নত হতো।

নূর!

আম্মি, আমি জানি না কেন এমন হতো। দস্যু বনহুরকে আমি যতই ঘৃণা করতে চাইতাম ততই আমার অচেতন মন মাথাচাড়া দিয়ে বলতো, না সে ঘৃণার পাত্র নয়–সে একজন মহান ব্যক্তি।

নূর নূর আব্বু আমার মনিরা নূরকে দুহাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে বলে–তুই যা বলছিস তা সত্য? সত্য বলছিস আব্বু?

হাঁ সত্যি বলছি আম্মি, দস্যু বনহুর যে আমার আব্বু এটা আমি ভাবতেই পারছি না। তাই তো আমার মন বলতে তোমার আব্বু সাধারণ লোক নয়–সে এক মহাপুরুষ। নূর দীপ্ত কণ্ঠে কথাগুলোবললো।

||||||||| মনিরার গন্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগলো আনন্দ অশ্রু। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললো মনিরা–নূর, আজ আমার কি যে আনন্দ, আমি আজ রাহুমুক্ত। আমার মনের আকাশ এতদিন যে জমাট অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়েছিলো তা স্বচ্ছ হয়ে গেছে, মেঘমুক্ত আকাশের মত পরিষ্কার হয়েছে আমার মন। নূর, তোর আব্বুর প্রতি তোর কোনো ঘৃণা নেই?

না আম্মি, নেই। আব্বুতো নিজের জন্য দস্যুতা করেন নি। আর সৎ মহৎ চরিত্রবান ব্যক্তিদের প্রতিও তিনি কোনোদিন আঘাত হানেন নি। তিনি যা করেছেন দেশের অসহায় মানুষের জন্য করেছেন। তিনি আঘাত হেনেছেন ঐ ব্যক্তিদের উপর যারা অসহায় মানুষের রক্ত শোষণ করে। নিজেদের ইমারত গড়ে তুলেছে, ঐশ্বর্যের পাহাড় সৃষ্টি করেছে–আমি নিজেও এসব মানুষকে ঘৃণা করি।

নূর, আমি তোকে দোয়া করি যেন চিরদিন অসহায় মানুষের জন্য তোর মন কাঁদে।

আম্মি, আমি নিজেও আজ গর্ব অনুভব করছি যে, আমার আব্বু সাধারণ মানুষ নন–তিনি একজন অসামান্য ব্যক্তি।

নূর, সব ব্যথা, সব দুঃখ আমার মুছে গেছে। তুই তাকে গ্রেপ্তার করেছিস তাতে আমার এতটুকু ক্ষোভ নেই, কারণ তুই কর্তব্য পালন করেছিস।

আম্মি!

হা নূর, আমি এতটুকু দুঃখ পাইনি তোর কাজে।

আব্বুকে গ্রেপ্তার করে তাকে হাঙ্গেরী কারাগারে আটক করে কঠিন শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। আমি পুত্র হয়ে তার প্রতি....

না না, কোনো অন্যায় তুই করিসনি নূর। মানুষ জানুক বুঝুক প্রখ্যাত ডিটেকটিভ নুরুজ্জামান চৌধুরীর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়নি।

আম্মি!

নূর, আজ আমার সব দুঃখ মুছে গেছে। সব ব্যথা মুছে গেছে, আজ আমি খুব খুশি।

নূর অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে মায়ের মুখের দিকে।

মুক্ত জানালা দিয়ে এক হলকা দমকা হাওয়া প্রবেশ করে কক্ষে।

নূরের এলোমেলো চুলগুলো হাওয়ায় উড়ে উড়ে ছড়িয়ে পড়লো তার কপালের চারপাশে।

*

জাভেদের ভারী বুটের শব্দে কান্দাই আস্তানার দরবারকক্ষ প্রকম্পিত হচ্ছিলো। তার দেহে আজ জমকালো ড্রেস ঠিক বনহুরের মত। মাথায় পাগড়ি কোমরের বেল্টে রিভলভার এবং সূতীক্ষ্ণ ধার ছোরা।

দরবারকক্ষের দেয়ালে দপ্ দপ্ করে মশাল জ্বলছে। অন্ধকার গুহায় মশালের আলো অদ্ভুত এক পরিবেশ ও ভাব সৃষ্টি করছে।

দুপাশে দাঁড়িয়ে আছে দুজন অনুচর।

জাভেদ বললো–বাপুকে ওরা হাঙ্গেরী কারাগারে শুধু আবদ্ধ করেই রাখেনি, তাকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হচ্ছে।

বললো একজন অনুচর–ছোট সর্দার, আমাদের জীবন থাকতে আমরা সর্দারকে এভাবে নির্মম শাস্তি ভোগ করতে দেবো না।

হাঁ, আমি বাপুকে উদ্ধার করে আনবোই। যদিও সন্ধান নিতে গিয়ে বিফল হয়ে ফিরে এসেছি। হাঙ্গেরী কারাগারের চারপাশ ঘিরে রয়েছে সশস্ত্র প্রহরী এবং কামান–গোলা বারুদ। তবু আমি এবার ব্যর্থ হবে না বলে মনে করছি।

ছোট সর্দার, আমরাও আশা করছি সর্দারকে উদ্ধার করে আনতে সক্ষম হবেন।

বললো জাভেদ–তোমরা প্রস্তুত হয়ে নাও। আজ রাতেই আমরা হাঙ্গেরী কারাগার অভিমুখে রওনা দেবো।

এমন সময় নূরী সেখানে উপস্থিত হলো।

সঙ্গে আশাও রয়েছে।

নূরীর হাতের মুঠায় হাতখানা রয়েছে।

বললে নূরী–জাভেদ, হাঙ্গেরী কারাগারে হুর আটক রয়েছে হয়তো এ কথা সত্যি নয়। তোকে বন্দী করার জন্য পুলিশমহলের এ কোনো নতুন ফন্দি নয় তো?

আশা বললো–জাভেদ যা শুনেছে তা মিথ্যা নয়। বনহুরকে পুলিশবাহিনী আটক করেছে এ কথা সত্যি। কারণ রহমান সব কথা বলেছে।

রহমান চাচা কোথায়? বললো জাভেদ।

একজন অনুচর বললো–এক্ষুণি এসে পড়বে। সে কোনো কাজে আস্তানার বাইরে গেছে।

জাভেদ কিছু বলতে যাচ্ছিলো, এমন সময় রহমান প্রবেশ করলো দরবারকক্ষে। জাভেদকে লক্ষ্য করে বললো–আমি ঠিক সন্ধান পেয়েছি সর্দারকে

ওরা কৌশলে বন্দী করেছে এখন তাকে হাঙ্গেরী কারাগারে আটক রেখে কঠিন শাস্তি দেওয়া হচ্ছে।

বললো জাভেদ–রহমান চাচা, এসব সংবাদ আমার গ্রহণ করা হয়ে গেছে।

তাহলে এখন আমাদের কি করণীয়? বললো একজন অনুচর।

রহমান বললো–তাকে উদ্ধার করা যদিও কঠিন তবুও আমরা নিশ্চুপ থাকতে পারি না। জাভেদ, তুমি প্রস্তুত।

হাঁ রহমান চাচা, আমি প্রস্তুত। যেমন করে তোক বাপুকে আমি মুক্ত করবোই এবং তরুণ গোয়েন্দটাকেও দেখে নেবো।

সত্যি আমরা ঐ ছোকরা টিকটিকিটাকে সায়েস্তা করতে চাই। বললো আর একজন অনুচর।

জাভেদ বললো পুনরায়–রহমান চাচা আমাদের যাত্রা শুরু হোক, আর বিলম্ব করা উচিত বলে মনে করি না।

আচ্ছা তাই হোক। বললো রহমান।

অন্যান্য অনুচর এবং রহমান বেরিয়ে গেলো দরবারকক্ষ থেকে।

*

জমকালো ড্রেসে সজ্জিত জাভেদ।

রহমানের শরীরেও সেই রকম পরিচ্ছদ।

জাভেদ এসে দাঁড়ালো আশা ও নূরীর পাশে।

নূরী কিছু বলবার পূর্বেই বললো জাভেদ–আম্মি, আমাদের যাত্রা শুরু। বাপুকে উদ্ধার না করা পর্যন্ত ফিরে আসবো না।

আশা বললো–জাভেদ, দোয়া করি তোমার চেষ্টা যেন সফল হয়।

আশার চোখ দুটো অশ্রুসজল হয়ে উঠলো।

নূরীর মনটা আশঙ্কায় দুলে উঠলো, কারণ সে জানে কান্দাই পুলিশবাহিনী অত্যন্ত সজাগ এবং কর্তব্যপরায়ণ। কাজে নিষ্ঠুর তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তারা জাভেদকে হত্যা করতেও কুণ্ঠাবোধ করবে না। পুলিশবাহিনী বনহুরকে গ্রেপ্তার করার জন্য দীর্ঘ সময় প্রচেষ্টা চালিয়ে বিফলকাম হয়েছিলো। আজ তারা সফল হয়েছে।

বললো জাভেদ কি ভাবছো আম্মি?

নুরী তাড়াতাড়ি নিজকে সামলে নিয়ে বললো–ভাবছি তোর বাপুর কথা। তাকে উদ্ধার করে ফিরে আয় এই কামনা করি।

হাঁ আম্মি, দোয়া করো। কথাটা বলে বেরিয়ে গেলো জাভেদ।

এমন সময় ভেসে এলো তার কানে নূপুরের ঝংকার।

তাকালো সে চারপাশে।

এ নূপুরের ঝংকার তার কাছে অতি পরিচিত বলে মনে হচ্ছে। একবার দুবার নয়, বেশ কয়েকবার তার কানে এ সুর ভেসে এসেছে, কিন্তু এ নূপুরের ঝংকার কোথা হতে আসছে তার কোনো হদিস খুঁজে পায়নি জাভেদ।

কান পেতে শুনছিলো, কেমন যেন তন্দ্রাচ্ছন্নের মত এগিয়ে যাচ্ছিলো সে ধীরে ধীরে গভীর জঙ্গলের দিকে।

আস্তানার বাইরে কিছু দূরে অপেক্ষা করছিলো রহমান ও আরও দুজন অনুচর। তাজসহ আরও তিনটি অশ্ব অপেক্ষা করছিলো সেখানে।

সবাই অপেক্ষা করছে জাভেদের।

কিন্তু জাভেদ তখন নূপুরের শব্দে মোগ্রস্তের মত এগিয়ে যাচ্ছে। কোথায় যাচ্ছে সে যেন নিজেও জানে না। জাভেদ এগুচ্ছে নূপুরের ঝংকার আরও স্পষ্ট হয়ে ভেসে আসছে তার কানে।

ভারী মিষ্টি সে

নিস্তব্ধ অন্ধকার ভেদ করে ঝংকার তুলছে।

জাভেদ ভুলে যায় তার পিতার উদ্ধারের কথা।

বিরাট বিরাট অজানা গাছগুলো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে এক একটা দৈত্যরাজের মত।

জাভেদ সেই অজানা দৈত্যরাজ সমতুল্য গাছগুলোর পাশ দিয়ে চলতে লাগলো।

সূর্যের আলোকরশ্মি প্রবেশ সক্ষম নয় অথচ সুরের লহরী বাধা পায় না, বাতাসে ভেসে আসে নূপুরের ঝংকার।

জাভেদ এবার থমকে দাঁড়ায়।

কেউ যেন পিছু ডাকে তারে।

চমকে উঠে তাকায় জাভেদ।

কিন্তু কেউ নেই।

শুধু দৈত্যরাজের মত গাছগুলো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে তার পেছনে, সামনে আশেপাশে।

আবার চলতে শুরু করে জাভেদ।

নূপুরের ঝংকার তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

একি মায়ার ঝংকার।

জাভেদের কঠিন মনে কোনো সুর কোনোদিন এমনভাবে দাগ কাটেনি, আজ সে নিজের অজ্ঞাতে এগিয়ে যাচ্ছে।

ওদিকে।

রহমান আর তাজ অপেক্ষা করছে জাভেদের।

আরও অপেক্ষা করছে দুজন অনুচর তাদের নিজ নিজ অশ্ব নিয়ে।

রহমান আর অনুচর বুঝতে পারে না জাভেদ এত বিলম্ব করছে কেন? তারা তাকাচ্ছে আস্তানার সুড়ঙ্গপথের দিকে।

কিন্তু জাভেদ অপর পথ দিয়ে আস্তানার বাইরে বেরিয়ে এসেছে তা জানে না রহমান ও তার সঙ্গীরা। ক্রমেই তারা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছে।

বললো একজন অনুচর–রহমান ভাই, এতক্ষণ হলো ছোট সর্দার আসছেন না কেন?

রহমান ভ্রুকুঁচকে বললো–আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে।

সন্ধ্যার পূর্বে তারা কান্দাই জঙ্গল অতিক্রম করে বাইরে বেরিয়ে আসবে ভেবেছিলো কিন্তু হয়তো সম্ভব হলো না।

রহমান চিন্তিত হলো।

হিংস্র জন্তুর গর্জন শোনা যাচ্ছে।

একটা জমাট অন্ধকার ক্রমেই ঘনীভূত হয়ে আসছে।

ঝি ঝি পোকার একটানা আওয়াজ ভেসে আসছে কানে।

তাজ সামনের পা দিয়ে বারবার মাটিতে আঘাত করছে। সে প্রস্তুত হবার পর নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকার জীব নয়।

বনহুরকে যেদিন পুলিশমহল গ্রেপ্তার করলো সেদিন তাজ ফিরে এসেছিলো শূন্য পিঠে। তাজের দুচোখে ছিলো উদ্বিগ্নতার ছাপ।

শূন্য পিঠে তাজ যখন ফিরে এলো তখন শুধু নূরী নয়, আস্তানার সবাইর মনটা ধক করে উঠেছিলো, তারা সবাই বুঝতে পেরেছিলো তাদের সর্দার গ্রেপ্তার হয়েছে। নাহলে সর্দার ফিরে আসতো নিশ্চয়ই।

মুষড়ে পড়েছিলো সবাই।

তারপর রহমান যখন ফিরে এলো তখন জানতে পারলো সত্যিই সর্দার গ্রেপ্তার হয়েছে তবে সঠিকভাবে কেউ জানতে পারেনি এ কথা সত্য না মিথ্যা। সর্দার গ্রেপ্তার হয়েছে, এ কথা সহজে বিশ্বাস করতে চাইছিলো না তারা।

কিন্তু বিশ্বাস হলো তখন যখন রহমান সত্য খবর সংগ্রহ করে নিয়ে এলো।

অনেক কথাই মনে পড়ছে রহমানের।

একটা হাত সে হারিয়েছে তাতে দুঃখ নেই, সর্দারের কোনো বিপদ এলে তাতে তার ব্যথা বা দুঃখের সীমা থাকে না। যদিও সর্দার বহুবার মৃত্যু গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হয়েছে তবু এ দূর্বলতা আছে রহমানের মনে। অবশ্যই একটা আশাও তার অন্তরে দৃভাবে বাসা বেঁধে আছে–সে হলো সর্দার যত বিপদেই পড়ুক উদ্ধার সে পাবেই, কারণ তাকে আটকে রাখার সাধ্য কারও নেই রহমান সর্দারকে নিয়ে নানা কথা ভাবে।

ক্রমেই সে হাঁপিয়ে উঠে।

কেন জাভেদ বিলম্ব করছে–তবে কি সে আস্তানা থেকে বের হতে পারেনি? নূরী কি তাকে ছাড়েনি? হয়তো তাই হবে। রহমান অনুচর দুজনকে লক্ষ্য করে বলে উঠলো–তোমরা অপেক্ষা করো, আমি আস্তানায় প্রবেশ করে দেখি ছোট সর্দার আসছেন না কেন?

অনুচরদ্বয়ের একজন বললো–আচ্ছা রহমান ভাই, তুমি চলে যাও, দেখে এসো কেন আসছেন না ছোট সর্দার।

নূরী তখন আশার চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলো আর গত জীবনের কাহিনী নিয়ে আলাপ আলোচনা করছিলো।

এমন সময় রহমান এসে দাঁড়ালো সেখানে–নূরী, জাভেদ কোথায়?

অবাক কণ্ঠে বললো–নূরী–সে তো বিদায় নিয়ে চলে গেছে তার বাপুর উদ্ধারে?

কই না তো? সে যায়নি। আমরা তার জন্য অপেক্ষা করছি।

তাহলে সে গেলো কোথায়?

আশা আশঙ্কাগ্রস্ত মনে বললো–আশ্চর্য, জাভেদ এতক্ষণ যায়নি রহমান?

না, তাইতো তার সন্ধানে এলাম।

কিন্তু নূরী চিন্তাযুক্তভাবে তাকালো সামনের জানালা দিয়ে বাইরে।

আশা বললো–আর বিলম্ব করা উচিত হবে না। তুমি যাও, সন্ধান করো কোথায় গেলো জাভেদ।

রহমান দ্রুত বেরিয়ে গেলো যেখানে তাজ আর দুটি অশ্ব এবং দুজন অনুচর অপেক্ষা করছিলো।

*

জাভেদ তখনও খুঁজে চলেছে।

নূপুরের ঝংকার কোথা থেকে আসছে।

চারদিকে অন্ধকার গাঢ় হয়ে পড়েছে।

হঠাৎ একটা আলোর ক্ষীণরশ্মি নজরে পড়লো জাভেদের। এবার সে আলোকরশ্মির দিকে এগুতে লাগলো।

জাভেদ যত এগুচ্ছে আলোকরশ্মি তত স্পষ্ট হয়ে নজরে পড়ছে।

আরও কিছুটা এগুতেই জাভেদ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো, তার নজরে পড়লো একটা আলো সামনে নূপুরের ঝংকার তুলে নাচছে এক তরুণী।

তার মুখমন্ডল দেখা যাচ্ছে না।

কালো কাপড়ে ঢাকা তরুণীর মুখ এবং মাথা।

জাভেদ অবাক হয়ে দেখছে।

একটা গাছের গুঁড়ির আড়ালে আত্মগোপন করেছিলো জাভেদ, যেন তাকে তরুণী দেখতে না পারে।

আলোকরশ্মিটা একটা ছোট প্রদীপশিখা।

তরুণীর আশেপাশে কেউ নেই।

তরুণী একা।

চারদিকে ঘন জঙ্গল।

শুধু আলোর প্রদীপটা নিভু নিভুভাবে জ্বলছে।

ঘন অন্ধকারে সামান্য একটা প্রদীপশিখা স্লানভাবে আলো বিতরণ করছিলো।

জাভেদ স্থির থাকতে পারলো না, এবার সে দ্রুত হাজির হলো তরুণীর পাশে।

সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেলো তরুণীর চরণযুগল।

নূপুরের ঝংকার বন্ধ হয়ে গেলো মুহূর্তে।

জাভেদ ধরতে গেলে ওকে।

অমনি তরুণী মুখে ঘোমটা টেনে সরে গেলো একপাশে।

সঙ্গে সঙ্গে দমকা হাওয়ায় নিভে গেলো প্রদীপটা।

জাভেদ অন্ধকারে আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না।

এমন সময় জাভেদের কানে ভেসে এলো তারই এক অনুচরের কণ্ঠস্বর–ঘোট সর্দার....ছোট সর্দার .... ছোট স র দার....

জাভেদ এবার ফিরে চললো যেদিক থেকে অনুচরটার কণ্ঠস্বর ভেসে আসছিলো সেইদিকে।

কিছুটা এগুতেই জাভেদ মিলিত হলো তার অনুচরটার সঙ্গে।

বললো অনুচরটা ছোট সর্দার আপনি!

হাঁ।

চলুন।

চলো।

এগুলো জাভেদ অনুচরটার সঙ্গে।

অদূরে রহমান তাজসহ অপেক্ষা করছিলো।

সঙ্গে অপর এক অনুচর, হাতে তার মশাল।

জাভেদ ও অনুচরটা এসে উপস্থিত হলো সেখানে।

রহমান বললো–ছোট সর্দার কোথায়, গিয়েছিলে তুমি?

জাভেদ একটু হেসে বললো– পথ ভুল করে ফেলেছিলে তুমি?

হ, রহমান চাচা?

আশ্চর্য বটে।

সত্যি বড় আশ্চর্য।

আমি ঠিক বুঝতে পারছি না তোমার কথা।

জাভেদ তাকায় অন্ধকারময় গভীর জঙ্গলের দিকে। মশালের আলোতে জাভেদের মুখখানা ঠিক বনহুরের মত লাগে। ঠিক বনহুরের মতই জমকালো পোশাক তার দেহে। মাথায় জমকালো পাগড়ি, জমকালো বেল্টে রিভলভার এবং সূতীক্ষ্ণ ধার ছোরা।

রহমান অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে জাভেদের মুখমন্ডলের দিকে।

জাভেদ বলে–রহমান চাচা, আমি প্রায়ই শুনতে পাই একটা অপূর্ব সুরের প্রতিধ্বনি, তা হলো নূপুরের ঝংকার।

নূপুরের ঝংকার?

হাঁ।

কিন্তু....এ গহন জঙ্গলে নূপুরের ঝংকার আসে কোথা থেকে।

আমি নিজেও তাই ভাবছি।

তাহলে কি কোনো যাদুকরী তোমাকে

হেসে বললো জাভেদ–না, কোনো যাদুকরী বা মায়াবিনী আমাকে ভোলাতে পারবে না রহমান চাচা।

তাকে কেন তুমি পথ ভুল করেছিলে?

ঠিক জানি না কেন আমি সেই নূপুরের শব্দ লক্ষ্য করে এগিয়ে গিয়েছিলাম।

জাভেদ, আর এমন ভুল করো না।

মনে থাকবে তোমার কথা রহমান চাচা।

তাহলে চলো এবার আমরা যাত্রা শুরু করি। কথাটা বললো রহমান।

বললো জাভেদ–তাই চলো।

জাভেদ তাজের লাগাম চেপে ধরলো, তারপর তাজের পিঠ চাপড়ে দিলো যেমনভাবে বনহুর তাজকে আদর করতো।

তাজ আনন্দে দুপা তুলে আনন্দসূচক শব্দ করলো।

জাভেদ বললো–যাত্রা আমাদের শুভ হোক।

নিজে সে উঠে বসলো তাজের পিঠে।

রহমানও অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করলো এবং দুজন অনুচর আরোহণ করলো নিজ নিজ অশ্বপৃষ্ঠে।

জাভেদ ও রহমান আগে।

তাদের অনুসরণ করলো অপর দুজন অনুচর।

সবার দেহেই জমকালো ড্রেস।

জমকালো অশ্বপৃষ্ঠে রাতের অন্ধকারে মিশে গেলো ওরা। শুধু শোনা যাচ্ছে অশ্বখুরের শব্দ খট খট খট…

[পরবর্তী বই বনহুর ও হাঙ্গেরী কারাগার]

বুকমার্ক করে রাখুন 0

Category: দস্যু বনহুর সমগ্র

পূর্ববর্তী:

« ৭.০৩ বনহুর ও নিশো

পরবর্তী:

৭.০৫ বনহুর ও হাঙ্গেরী কারাগার »